মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীদের পত্রিকা

নবীন

সপ্তদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯

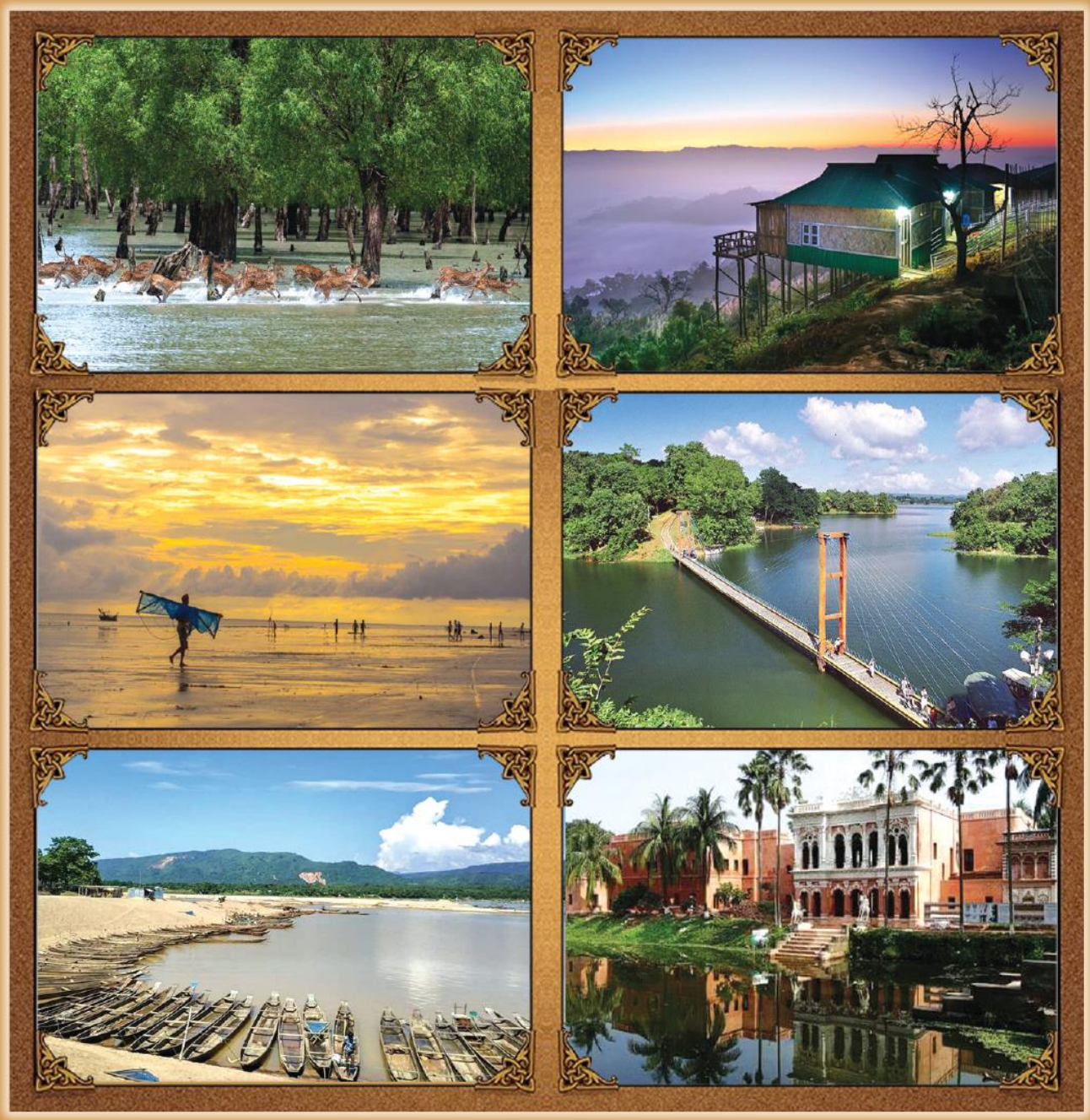

কাজীর মসজিদ। রংপুর বিভাগে অবস্থিত একটি প্রাচীন মসজিদ। কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর উপজেলার দলদলিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত। এর নির্মাতা ও সময় কাল সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া না গেলেও এর পুব দেয়ালে যে ফারসি ভাষায় খোদাই করা শিলালিপি পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায়, মসজিদটির নির্মাতা কাজী কুতুবুদ্দিন। তার নামানুসারে এর নামকরণ করা হয় কাজীর মসজিদ। ধারণা করা হয়, তিনি ছিলেন এ উপমহাদেশে ধর্ম প্রচার করতে আসা রাসুল (সা.) এর সাহাবি। কাজীর মসজিদে তিনটি গম্বুজ আছে। মসজিদটির পুরোনো ভবন বেশ বড় এবং এটি শক্ত ভিত্তির ওপর নির্মিত। এটি নির্মাণের জন্য ব্যবহার হয়েছে ইট, পাথর ও সুরকি। এটি যখন আবিষ্কার করা হয় তখন এর চারপাশে ছিল জঙ্গল। তা দেখে বোঝা যায় এটি অনেক আগে নির্মিত। মসজিদের পুবদিকে প্রাচীনকালের সানবাঁধানো একটি পুকুর আছে।

বেলাব বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ। নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলা বাজারে অবস্থিত। আনুমানিক প্রায় ৪শ বছর পূর্বে জমিদারী আমলে এলাকার অন্য মসজিদ থেকে একটু ভিন্ন কাঠামোতে প্রতিষ্ঠা করা হয় মসজিদটি। প্রায় ১২ শতাংশ জমির ওপর সাদা চুনের পালিশে মজবুত পিলারের সাত গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির প্রতিষ্ঠাতা ও জমিদাতা বীরবাঘবের আলহাজ মাহমুদ আলী ভুঁইয়া, যিনি মামদী ব্যাপারী নামে পরিচিত। মসজিদটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই জুমার নামাজে প্রচুর লোক হতো। দিন দিন মুসল্লিদের সংখ্যা আরো বাড়তে থাকে। নরসিংদী জেলার বিশিষ্ট শিল্পপতি, শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবক আলহাজ আব্দুল কাদির মোল্লা কর্তৃক ২০০৮ সালে বর্তমান অবকাঠামোটি নির্মিত হয়।

নবীন

সপ্তদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯

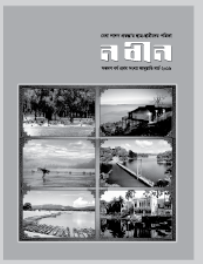

সূ|চি|প|ত্র

নতুন ঊষার অভ্যুদয় ২
এই জীবন যদি জীবন হয় তাহলে আসল জীবন কোথায় ৩
বিদেশিরা লিখছে বাংলা ৫
প্রভাত ফেরি ফিরিয়ে দিন ৭
ভাস্কর্যে মুক্তিযুদ্ধ ৮
অংকুর ১০
অক্সফোর্ড স্টুডেন্টস ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের আনিশা ১৪
বাংলাদেশের তরুণদের নাসার অ্যাপস চ্যালেঞ্জ জয়ের গল্প ১৫
প্রকল্প সংবাদ ১৬
জ্যঁ তিরোল : সম্ভাবনার পাশাপাশি বিপদের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে ডিজিটালাইজেশন ২০
স্বাস্থ্য বিষয়ে যত প্রতিকথা ২২
হারিয়ে যাচ্ছে শিষ্টাচার ২৩
মেনা ট্রট: ব্লগকে আমজনতার কাতারে নামিয়ে আনার পিছনের কারিগর ২৪
প্রশিক্ষণ পাবে এক লাখ বেকার ২৫
দেশের সেরা ১০ পর্যটন স্পট ২৬
অংকুর ২৭
বিসিএস প্রস্তুতি: অগ্নিপরীক্ষার জন্য তৈরি তো? ২৮
ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদনের নিয়ম ও প্রস্তুতি ২৯
মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে ৩০
মাথায় কত প্রশ্ন আসে ৩১

সম্পাদক : তাসনিম হাসান হাই সহকারী সম্পাদক : মো. শাহরিয়ার পারভেজ

প্রকাশক : হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ৯-সি, রূপায়ন শেলফোর্ড, প্লট নং ২৩/৬, ব্লক-বি, বীর উত্তম এ এন এম নুরুজ্জামান সড়ক শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭। ফোন : ৯১২১১৯০, ৯১২১১৯১, ০১৭২৭২০৯০৯৮। ই-মেইল : hdf.dhaka@gmail.com

নতুন উষার অভ্যুদয়

ওই একটা রাত আমাদের পৃথিবীকে আমূল পাল্টে দিয়েছিল। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাত।

মার্চ মাসের গোড়া থেকে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে চলছিল অসহযোগ আন্দোলন। এমন অসহযোগ আন্দোলন আর কেউ দেখেনি কোথাও। সেনানিবাস ছাড়া কোথাও কর্তৃত্ব ছিল না পাকিস্তান সরকারের। পূর্ব বাংলা চলছিল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। অফিস-আদালত, ব্যাংক ও বিমা সংস্থা, ডাক ও তার বিভাগ, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় আর সবকিছুই মান্য করেছিল নেতাকে। প্রধান বিচারপতি পর্যন্ত শপথবাক্য পাঠ করাননি প্রাদেশিক গভর্নরকে।

৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধু দিয়েছিলেন অমোঘ ঘোষণা–এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। দেশের অধিকাংশ মানুষ চাইছিল, তিনি স্বাধীনতার ঘোষণা দিন–অনেক হয়েছে, আর পাকিস্তানে নয়। একতরফা স্বাধীনতার ঘোষণা দেননি বঙ্গবন্ধু–তার দায় নিতে চাননি। কিন্তু তিনি ঠিকই জানিয়ে দিলেন, আমরা লড়ছি স্বাধীনতার জন্যে, লড়ছি মুক্তির জন্যে।

ওই যে বললাম দায় নিতে চাননি, সে-দায় তো তাঁর একার নয়। স্বাধীনতা ঘোষণা করলে কোটি কোটি মানুষের ওপর নেমে আসত আঘাত। সে আঘাতের বাস্তব রূপ আমাদের কল্পনায়ও ছিল না। তাই ছয় দফা দাবির ভিত্তিতে সংবিধান-রচনার শেষ প্রচেষ্টারূপে ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন নেতারা। শাসকদের কাছে তা ছিল আঘাত হানার প্রস্তুতির জন্যে কালক্ষেপণ। প্রতারণা করেই ক্ষমতাধরেরা স্বদেশে ফিরে গেলেন ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায়। যে-আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তারা মাসাধিককাল ধরে, তা বাস্তবায়নের আদেশ দিয়ে গেলেন যাওয়ার আগে।

২৫শে মার্চ মধ্যরাতের সামান্য আগে শুরু হলো সেই তাণ্ডব–সাম্প্রতিক ইতিহাসের এক অতিনিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ। নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপর এক প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সর্বশক্তি দিয়ে আক্রমণ। পুলিশ আক্রান্ত, আনসার আক্রান্ত; আক্রান্ত ইপিআরের সদস্য, সেনানিবাসের বাঙালি সেনা। ছাত্রাবাস, বস্তি, সংবাদপত্রের অফিস–সবই পিষ্ট হলো পেশিশক্তির বুটের তলায়। ছাত্রহত্যার পর মুষ্টিমেয় কজনকে দিয়ে গোর খুঁড়িয়ে আর লাশ বহন করিয়ে তাঁদেরকেও মরদেহের শামিল করা হলো। বস্তি পুড়ল, শিশুকে কোলে নিয়ে স্তন্যদানকারী মা লুটিয়ে পড়লেন চিরদিনের মতো, রিকশার ওপরেই পড়ে রইল রিকশাওয়ালার নিথর দেহ। দোকানি প্রাণ দিলেন দোকানের ভেতরে, শিক্ষক আত্মাহুতি দিলেন নিজের আবাসে। সংবাদপত্র অফিস পুড়ল, সেই আগুনে সাংবাদিক শহীদ হলেন। পুলিশ-আনসার, ইপিআর-সেনাবাহিনীর বাঙালি সদস্যরা যতক্ষণ পেরেছেন, প্রতিরোধ করেছেন, তারপর হয় শহীদ হয়েছেন, নয় আত্মরক্ষা করতে জায়গা ছেড়েছেন।

সেই মধ্যরাতে গ্রেপ্তার হলেন জনগণের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিব–যিনি ভীতি বা প্রলোভন কোনোটাতেই আপস করেননি। প্রায়

সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর নামে প্রচারিত হলো স্বাধীনতা-ঘোষণার দুটি ইংরেজি ভাষ্য–ইপিআর সিগন্যাল কোরের সুবেদার-মেজর শওকত আলী পাঠালেন নিজের তৈরি পোর্টেবল ট্রান্সমিটার থেকে (পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়ে তিনি শহীদ হন), বলধা গার্ডেন থেকে ইপিআরের আর কয়েকজন সদস্য পাঠালেন একটি বহনযোগ্য ট্রান্সমিটার থেকে (তারপর সেটা সেখানেই পুকুরে ফেলে দিয়ে তাঁরা চলে যান), আর পাঠালেন মগবাজার ওয়্যারলেস স্টেশনের শিফট-ইন-চার্জ মেজবাহউদ্দিন আহমদ তাঁর সরকারি সম্প্রচারযন্ত্র থেকে (সেটা গ্রহণ করলেন চট্টগ্রামের সিলিমপুর ওয়্যারলেস স্টেশনের প্রকৌশলী আবদুল কাদের আর তাঁর তিন সহকর্মী)। সে-ঘোষণায় সবাইকে আহ্বান করা হলো শত্রুসেনা প্রতিরোধ করতে; বলা হলো, আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।

প্রথমে প্রতিরোধ, তারপর প্রতি-আক্রমণ, গেরিলা-যুদ্ধ, ভারতীয় বাহিনীর সহায়তায় সম্মুখসমর। নয় মাসের কিছু কম সময়েই দেশকে মুক্ত করা সম্ভবপর হলো। কোনো কোনো দেশের বৈরিতা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক সমর্থন ছিল আমাদের পক্ষে। এ-সময়ে বঙ্গবন্ধু অনুপস্থিত, কিন্তু তাঁকেই রাষ্ট্রপতি করে গঠিত হয়েছিল বাংলাদেশ সরকার, তাঁর নামেই পরিচালিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ।

২৫শে মার্চ রাতে যে-নির্মম গণহত্যা শুরু হয়েছিল, এক অর্থে তার অবসান হয় মধ্য-ডিসেম্বরের বুদ্ধিজীবী হত্যার মধ্য দিয়ে। মধ্যবর্তী সময়ে মানুষ স্বেদ দিয়েছে, রক্ত দিয়েছে, সম্ভ্রম দিয়েছে। আবালবৃদ্ধবনিতার আত্মত্যাগে দেশের মুক্তি ত্বরান্বিত হয়েছে। পাশবিকতা যে কী, তা জেনেছে তখন যাঁদের মনে রাখার বয়স হয়েছিল, তাঁদের সকলে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল প্রকৃতই জনযুদ্ধ। এ-যুদ্ধ নিয়ে সেদিনের সব প্রাপ্তবয়স্ক মানুষেরই বলবার মতো কথা আছে। নয় মাসে অনেক বীরত্বগাথা রচিত হয়েছে। বলা হয়, ফরাসি বিপ্লবের সময়ে প্রত্যেক ফরাসি পরিণত হয়েছিল অতিমানবে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে ঠিক তা-ই ঘটেছিল। বাঙালি–শুধু এই পরিচয়ের ভিত্তিতে বাড়িতে জায়গা দিয়েছে মানুষ, অন্ন ভাগ করে নিয়েছে। মুক্তিযোদ্ধা–শুধু এইটুকু জেনেই তাকে সর্বপ্রকার সহায়তা দিয়েছে। রণাঙ্গনে তো বটেই, রণাঙ্গনে না গিয়েও মানুষ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। ২৬শে মার্চ তাই আমাদের স্বাধীনতা দিবস, নতুন উষার অভ্যুদয়।

জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান
প্রথম আলো ২৬ মার্চ ২০১৯

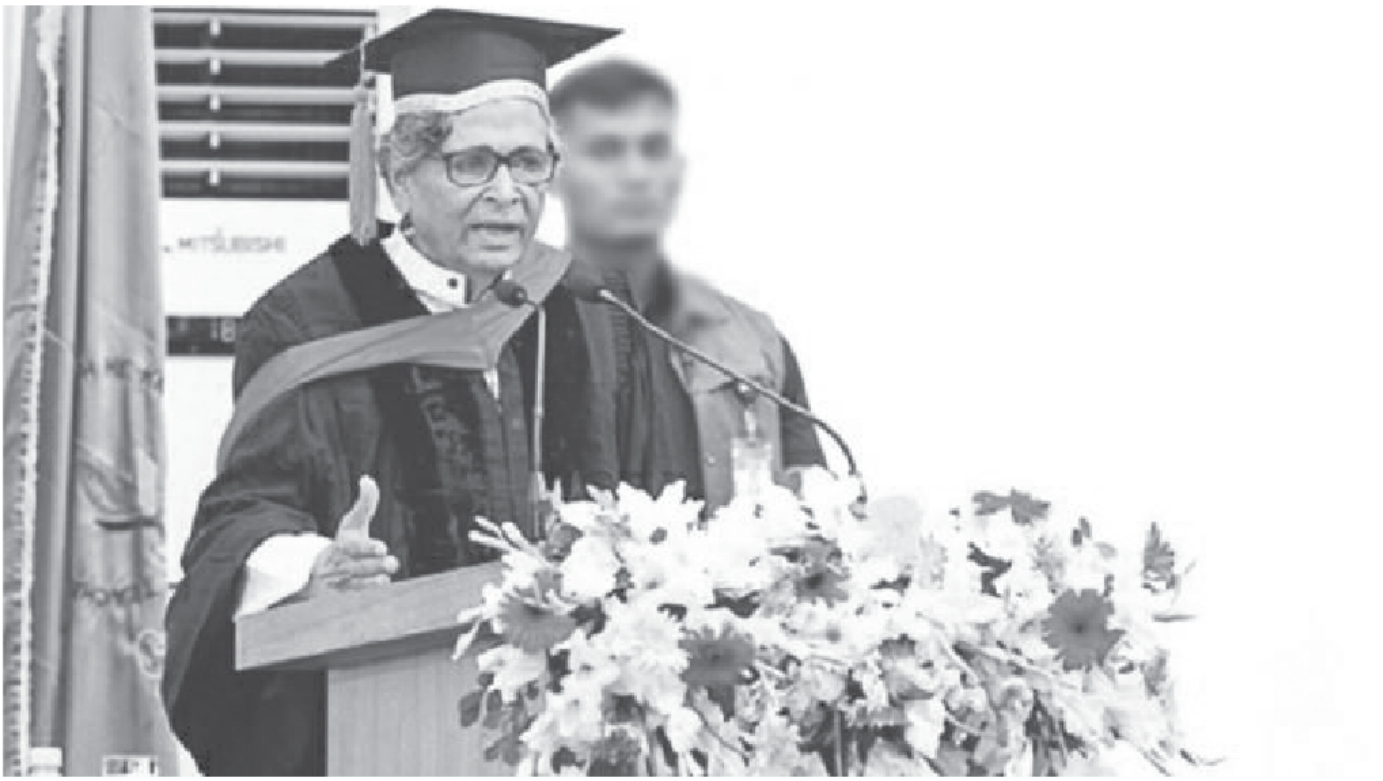

এই জীবন যদি জীবন হয় তাহলে জীবন কোথায়

[বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। গত ২৮ মার্চ ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশের (আইইউবি) সমাবর্তনে বক্তা ছিলেন তিনি। তাঁর বক্তৃতাটি নিচে দেওয়া হলো।]

আমি প্রথমেই একটা ছোট্ট গল্প দিয়ে আমার কথার শুরু করি। গল্পটা এ রকম যে, এক হাসপাতালে পেটে প্রচণ্ড ব্যথা নিয়ে এক রোগী এল। সঙ্গে সঙ্গে তার এক্স-রে করা হলো। কিন্তু একি! রোগীর পেটের মধ্যে শত শত চায়ের চামচ দেখা গেল। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো, 'তোমার পেটে এত চায়ের চামচ এল কী করে?' সে তখন কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দিল, 'স্যার, ওই যে বিখ্যাত ডাক্তার কাদির সাহেব, এফসিপিএস, এমআরপিএস বলেছেন দিনে দুই চামচ করে তিনবার খেতে।'

তো আমরা এই ডাক্তার কাদির সাহেবের মতো মানুষ দ্বারাই আসলে পরিচালিত হই। তারা যা বলেন, আমরা তা-ই করি। আমরা কখনো দেখি না চায়ের চামচ খাওয়া ভালো, না খারাপ। এটা আমরা ভাবি না। এতে আমাদের কোনো ভালো-খারাপ কিছু হয় কি না, সেটা আমরা বুঝতে পারি না। আমাদের জীবনে এই ডাক্তার কাদির কারা? এই কাদির হচ্ছেন আমাদের অভিভাবক, আত্মীয়, আমাদের বন্ধুবান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীসহ গোটা পৃথিবী। তারা আমাদের যা করতে বলেন আমরা তা-ই করি। যেমন: আমার আব্বার কাছে শুনেছি যে তারা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত তখন বলা হতো যে গণিত আর দর্শনই সেরা বিষয়। তাই এ দুটো পড়তে হবে। আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পা দিলাম, তখন যুগ পাল্টে গেল। তখন সেরা হলো ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং। আবার মানবিকের শিক্ষার্থী হলে ইংরেজি অথবা অর্থনীতি। কারণ ওই দুটো দিয়ে সিএসপি হওয়ার সুবিধা ছিল। তারপর আরও সময় পার হলো। এখন এসে দাঁড়িয়েছে বিবিএ, এমবিএ। একের পর এক চাপের মধ্যে আমরা পিষ্ট হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমরা এর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারছি না। কোনোকালেই আসলে কেউ কিছু করে উঠতে পারেনি। আমি কী চাই, আমি কী করতে ভালোবাসি, আমার প্রাণ কী চায়, আমার জীবনের আনন্দ কোথায়–এই খবর কেউ নিতে আসে না। ফলে আমরা সারা জীবন ধরে আমাদের হৃদয়ের সঙ্গে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চালিয়ে যাই।

আমরা আমাদের কোনো দিন চিনতে পারি না। নিজেদের কোনো দিন খুঁজে বের করতে পারি না। আমরা আমাদের আনন্দজগৎকে তাই কোনো দিন আত্মস্থ করতে পারি না। অবশ্য এ রকম হওয়ার কারণ আছে। কেন আমাদের এসব বলা হয়? একটা কারণ হলো দারিদ্র্য। আমাদের দেশে কিছুসংখ্যক মানুষ ছাড়া বাকি সব মানুষ দারিদ্র্যসীমার এত নিচে থাকে যে নিজের ইচ্ছামতো কিছু করার ক্ষমতা থাকে না। নিজের প্রাণের খোরাক জোগানোর সুযোগ আমরা কমই পাই। সুতরাং যেখানে অর্থ আছে, যেখানে টাকা আছে সেখানে আমাদের চলে যেতে হয়। সেটা আমাদের ভালো লাগুক আর না-ই লাগুক।

আরেকটা সমস্যা হলো আমাদের বাবা-মাকে নিয়ে। যেমন আমরা ১১ ভাইবোন ছিলাম। আমার দাদারা ছিলেন মাত্র ১৮ ভাই এবং ১৪ বোন। এত ছেলেমেয়ে সেকালে থাকত যে বাবা-মা তাদের ঠিক দেখেশুনে রাখতে পারত না। তাই তাদের নিয়ে তেমন কোনো চাপ ছিল না। তারা নিজেদের যা ইচ্ছা তাই হতে পারত। কিন্তু আজকে ছেলেমেয়ের সংখ্যা ২-এ নেমে এসেছে। সব সময় বাবা-মায়ের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যে তাঁর ছেলেমেয়ে কী করছে। আজকের ছেলেমেয়েরা যেন বন্দিশালাতে আটকে আছে। সর্বদা নজরদারির কড়া শিকলে বন্দী তারা। আজকের মতো অত্যাচারিত শিশু আমাদের দেশে কখনো ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা, বাবা-মা যা হতে পারেননি, ওই ১-২ জন ছেলেমেয়ে দিয়ে তারা তার প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করেন। এটা তো বড় কঠিন কাজ। এই বাচ্চা ছেলেমেয়ে কীভাবে এই বড় দায়িত্ব পালন করবে।

এরপর এল চাকরি। চাকরি এক মজার জায়গা। এখানে বাণিজ্যিক প্রভুরা তাঁদের মর্জি চালান। তিনজন মানুষ লাগবে। নেবে একজন। তাকে আবার বেতন দেবে দুজনের। তাতে টাকার পরিমাণ বাড়ে। সাথে যে চাকরি পেল সে নিজেও এত টাকা পেয়ে খুশি হয়। কিন্তু সকাল আটটায় অফিসে ঢুকে রাত ১০টা নাগাদ বাসায় ফেরার পর তার মনে আর কোনো শান্তি থাকে না। বাড়ির টেলিভিশনের সামনে টাইটা খুলে দিয়ে সে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে। এই দৃশ্যটা দেখতে মোটেও ভালো লাগে না। তাদেরকে চিপে, পিষে তাদের সমস্ত রক্ত আমরা নিয়ে যাচ্ছি। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই এটা নিয়ে আন্দোলন হয়েছিল। তখন কবি বলেছিলেন,

'হোয়াট ইজ লাইফ ইফ ফুল
অব কেয়ার
উই হ্যাভ নো টাইম টু স্ট্যান্ড
অর স্টেয়ার'

এই যে ঊর্ধ্বশ্বাস জীবন, এই যে কাজ, এই যে ব্যস্ততা–এসব মিলিয়েই কি আমাদের জীবন? আমরা কি একটু দাঁড়াতে পারব না? আমরা কি একবার এই চারপাশের সুন্দর পৃথিবীর দিকে তাকানোর সুযোগ পাব না? এত অসাধারণ-অবিশ্বাস্য পৃথিবীতে আমরা যে এসেছি, সেটার কোনো আনন্দ কি আমরা নিতে পারব না? কেন এই কথা হয়েছিল? ১৮১৯ সালের দিকে ইংল্যান্ডে একটা আইন পাস হয়েছিল। কাউকে ২০ ঘণ্টার বেশি কাজ করানো যাবে না। কী রকম মারাত্মক আইন আপনি চিন্তা করুন। তখন হয়তো ২২ ঘণ্টা খাটানো হতো। হয়তো কর্মীকে তারা ঘুমাতেই দিত না। এ রকম ভয়ংকর নির্যাতনও সেই সময়ে করা হয়েছে মানুষের ওপর। এই যে 'মে ডে'তে শিকাগোতে শ্রমিকদের ওপরে গুলি করা হয়েছিল। শ্রমিকেরা কী চেয়েছিল? শুধু ৮ ঘণ্টা কাজ, ৮ ঘণ্টা ঘুম আর ৮ ঘণ্টা আনন্দ করার সুযোগ চেয়েছিল। কিন্তু প্রভুরা বলেছিল যে ৮ ঘণ্টা আনন্দ করা চলবে না। সেটার ভেতর ৬ ঘণ্টা তাদের জন্য কাজ করতে হবে। এই নিয়ে শেষ পর্যন্ত এ রকম দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে।

আমি আরেকটা ছোট্ট গল্প দিয়ে শেষ করি। পথে যেতে যেতে একজন যুবকের সঙ্গে দেখা হলো অপূর্ব এক সুন্দরীর। সুন্দরীকে দেখেই সে প্রেমিক যুবক বলে বসল, 'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।' আবার সুন্দরীরও এই যুবককে অপছন্দ নয়। তারও ভালো লেগেছে। কিন্তু সে বলল, 'আমি একটু অসুবিধায় আছি। আমার বাড়ি হলো সাত সমুদ্রের ওপারে। আমি আমার বাবার সঙ্গে সেখানে যাচ্ছি। এখন তো আর আমাদের বিয়ে সম্ভব নয়। তুমি সেখানে এসো। তখন আমি এই বিষয়ে ভেবে দেখব।'

যুবক তো আর অপেক্ষা করতে পারল না। কিছুদিন পরেই সে সুন্দরীর জন্য সাত সমুদ্রের উদ্দেশে পাড়ি জমাল। প্রথম সমুদ্রের পাড়ে সে যখন গেল, সেখানে এক খেয়া মাঝি সাগর পার করে দেবে। সেই খেয়া মাঝি তাকে বলল, 'আমি চাইলেই তোমাকে এই সমুদ্র পার করে দিতে পারি। কিন্তু এ জন্য তোমাকে তোমার হৃৎপিণ্ডের সাত ভাগের এক ভাগ দিয়ে দিতে হবে।' সে ভাবল যে তার এত গভীর প্রেম। প্রেমের জন্য না হয় একটু ত্যাগ স্বীকার সে করলই। সে রাজি হয়ে যায় মাঝির কথায়। পার হলো সে প্রথম সাগর। দ্বিতীয় সাগরের খেয়া মাঝিও একই কথা বলল। এভাবে দিতে দিতে সাত সমুদ্র সে যখন পার হলো তখন দেখা গেল তার মাঝে হৃদয় বলে আর কিছুই নেই। তার হৃদয় খণ্ড খণ্ড হয়ে হারিয়ে গেছে।

এই যে আমাদের সময়ের ওপর যে নিষ্পেশন, যে টানাপোড়া চলে এই আমাদের ব্যস্ত জীবন নিয়ে, সেটা আমাদের জন্য কোনো সুফল বয়ে আনে না। আমাদের জীবন যে আনন্দের এক নতুন উৎস, সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে। জীবনের এই আনন্দ আমরা খুঁজে পাই সময়ের কাছ থেকে। কেউ যদি আমাদের কাছ থেকে এই সময়কেই কেড়ে নেয়, তাহলে আমরা কীভাবে সুখী হয়ে বেঁচে থাকব? আমরাও যদি আমাদের সময়কে অন্য কাউকে দিয়ে দিতে থাকি, তাহলে আমাদের জীবন কোথায়? কীভাবে আমরা আমাদের ভেতরের মানুষকে গড়ে তুলব?

নাসিরুদ্দিন হোজ্জার একটা গল্প আছে যে এটা যদি বিড়াল হয় তাহলে কাবাব কোথায়। আবার এটাই যদি কাবাব হয় তাহলে বিড়ালটা কোথায়। তো এই জীবন যদি জীবন হয় তাহলে আসল জীবন কোথায়? তাই আমি এই তরুণদের কাছে বলব রবীন্দ্রনাথের একটি কথা:

'বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই
গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম
দুটি নয়ন মেলে।'

এই যে অপরূপ বিশ্বতা আমাদের চোখ দিয়ে, আমাদের ইন্দ্রিয় দিয়ে আমাদের জীবন দিয়ে যদি উপভোগ না করে যাই তাহলে আর এই জীবনের মানে কী? আমি সবাইকে অনুরোধ করব এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাবতে। কেননা তোমরা এখন জীবনের পথে অগ্রসর হতে যাচ্ছ। তোমাদের এখনই ভাবার সময়। পরে আর এসব ভেবে কোনো লাভ হবে না। তোমাদের আগামী সময়ের জন্য শুভকামনা রইল। সকলকে ধন্যবাদ।

প্রথম আলো ০৭ এপ্রিল ২০১৯

বিদেশিরা শিখছে বাংলা

'আমি বাংলায় কঠা বলটে পারি' শিশুদের মতোই ভাঙা উচ্চারণে নিজের বাংলা ভাষা শেখার প্রতি আগ্রহের কথা জানালের এ্যানি। ১৩ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমির বইমেলায় বাসন্তী শাড়ি পরে ঘুরতে এসেছে ব্রিটিশ নাগরিক এ্যানি। সঙ্গে এক প্রবাসী জানান, এ্যানি বাংলা ভাষা শিখছে। চীনের শিক্ষার্থী ইরা জানান, ভালো লাগা থেকেই বাংলা ভাষা শিখছেন। তবে বাংলাদেশে ব্যবসা ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ করার ইচ্ছার কারণেও শিখেছে বলে তিনি জানান। শুধু ব্রিটিশ এ্যানি ও চীনা ইরা নয়; বাংলা ভাষার প্রতি দরদ এবং কর্মজীবনেরর প্রয়োজনে অনেক বিদেশি বাংলা ভাষা শিখছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইন্সটিটিউট এবং বনানীর 'লার্ন বাংলা' নামের প্রতিষ্ঠানে চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়ান, কোরিয়ান, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকরা বাংলা ভাষা শিখছেন। অথচ আমরা বাংলা ভাষা শুদ্ধ করে শেখার বদলে মায়ের ভাষাকে অবজ্ঞা করছি।

আ'মরি বাংলা ভাষা। বিশ্বের সবচেয়ে মিষ্টি ভাষা হলো এই বাংলা। ২০১০ সালে ইউনেস্কোর জরিপে বিশ্বের সবচেয়ে 'মিষ্টি ভাষা' হিসেবে বাংলা ভাষা নির্বাচিত হয়। '৫২ সালে আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত রাষ্ট্রভাষা বাংলা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার গৌরব অর্জন করেছে। সেই মায়ের ভাষার শুদ্ধতা এবং সমৃদ্ধশালী করতে আমাদের কোনো গরজ নেই। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. কুদরত ই খুদা'র বাংলার সমৃদ্ধিতে অসামান্য অবদান রাখলেও এখন ভাষাবিদদের শুদ্ধভাষা চর্চা নিয়ে মাথাব্যথা নেই। অথচ বাংলা ভাষার গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ায় বিদেশিরা বাংলা ভাষা শিখতে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসছে। বাংলা ভাষার প্রতি বিদেশিদের এই আগ্রহ কি আমাদের লজ্জা দেয় না? ফেব্রুয়ারি এলেই বাংলা ভাষা নিয়ে শুরু হয় হৈচৈ। অতঃপর...।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে প্রতি বছর অসংখ্য বিদেশি শিক্ষার্থী বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করেন। এর মধ্যে বাংলা ভাষা শিখতে চায় এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি। জাপান, চীন, কোরিয়া, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, রোমানিয়া, হাঙ্গেরী, থাইল্যান্ড, নেপালসহ বেশ কয়েকটি দেশের শিক্ষার্থী ও তরুণ এনজিও কর্মীরাই মূলত বাংলা ভাষা শেখার ক্ষেত্রে বেশি আগ্রহী। তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কর্মজীবনের প্রয়োজনে তাদের যেমন বাংলা ভাষা দেখা দিতে ঝুঁকতে হচ্ছে; তেমনি কেউ কেউ

শুধুমাত্র ভালোবাসার টানে বাংলা ভাষা শিখছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের শিক্ষকদের মতে বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রসরতায় বিদেশিদের অনেকে চাকরি ও ব্যবসার প্রয়োজনে বাংলা শিখছেন। বিদেশি যারা বাংলা ভাষা শিখতে আসেন তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তারা যখন বাংলা শিখতে পাঠ নেন; তখন বানান ও উচ্চারণের বিভিন্ন সমস্যায় পড়েন। কেউ কেউ আক্ষেপ করে বলেন, তোমরা ভাষার অধিকারের জন্য জীবন দিয়েছো অথচ বাংলা ভাষার উন্নয়নের জন্য কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না কেন? দুঃখজনক হলেও বিদেশি টিভি স্টার জলসা, স্টার প্লাসের কারণে আমাদের ছেলেমেয়েদের অনেকেই বাংলার চেয়ে ভালো শুদ্ধ হিন্দি বুঝতে পারে। কিন্তু দেশের ভাষাবিদ, গবেষকরা নির্বিকার। হিন্দি ও ইংরেজির বহুল প্রভাব থেকে নতুন প্রজন্মকে বাঁচাতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ সরকার সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিয়েছে।

নিজেদের ভাষা সংস্কৃতি ভুলে প্রতিনিয়ত অনেক বাংলাদেশি ইংরেজিসহ অন্যান্য ভাষার পিছনে ছুটছে। তবে আশার কথা হলো, সেই বিদেশিরা এখন শিখছে বাংলা। বাংলাদেশে বিদেশি শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষা শেখায় এমন একটি প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট। এখান থেকে প্রতি বছর ৪০ জনেরও বেশি বিদেশি শিক্ষার্থী বাংলা ভাষা শিক্ষা নিচ্ছে বলে প্রতিষ্ঠান সূত্রে জানা গেছে। জানা য়ায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে প্রতি বছর প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থী বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করেন। এর মধ্যে বাংলা ভাষা শিখতে চায় এমন বিদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যাও কম নয়। সম্প্রতি চীনের শিক্ষার্থীর ভাষা ইনস্টিটিউটে সম্প্রতি ৪ মাসের এক কোর্সে অংশ নেয়। সফলভাবে কোর্সটি সম্পন্ন করার পর তারা সনদপত্রও গ্রহণ করেছে। এ উপলক্ষে ভাষা ইনস্টিটিউট আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা বাংলায় বক্তৃতা দিয়েছে। বাংলা গান গেয়েছে। ভাষা ইনস্টিটিউটের অফিস কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে জুনিয়র কোর্স, ডিপ্লোমা কোর্স ও সিনিয়র ডিপ্লোমা কোর্স চালু আছে। তবে বর্তমানে ১০ জনের মতো বিদেশি শিক্ষার্থী জুনিয়র কোর্স করেছে। নতুন করে ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি শুরু হবে বলেও তারা জানিয়েছেন। এছাড়া আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের অধীনে চার বছর মেয়াদি অনার্স চালু হচ্ছে বলে জানা গেছে।

আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের শিক্ষিকা ড. আয়েশা বেগম বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এ কারণে অনেকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষা শিখছে। বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী ও এনজিও কর্মীদের মধ্যে বিশেষ করে বাংলা ভাষায় আগ্রহ বেশি তৈরি হয়েছে। অনেক শিক্ষার্থীর কাছে তৃতীয় ভাষা হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এছাড়া বাংলা ভাষা অনেকে ভালোবেসে শিখছে বলেও তিনি জানান।

চীনের শিক্ষার্থী ইরা জানিয়েছেন, বাংলা ভাষা মূলত তিনি ভালো লাগা থেকেই শিখছেন। তবে বাংলাদেশে ব্যবসা ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ করার ইচ্ছার কারণেও শিখেছে বলে তিনি জানিয়েছেন। এছাড়া বাংলা ভাষা খুবই মধুর ভাষা বলে তিনি জানান। জাপানের বিদেশি এক শিক্ষার্থী জানান, আমি এ দেশে আসার পর থেকেই বাংলা ভাষা শেখার আগ্রহ তৈরি হয়েছে। ভাষাটি শুনতে ও বলতে খুবই মধুর লাগে।

এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বাংলা শেখা বিদেশি শিক্ষার্থীদের সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ছে। তবে তাদের থাকার মতো যথেষ্ট আবাসন সুবিধা না থাকায় অন্যান্য বিভাগে আগের থেকে এখন বিদেশি শিক্ষার্থীরা অনেক কমে গেছে। তারপরও বিদেশিদের মধ্যে বাংলা শেখার আগ্রহের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোনো বিভাগ থেকে বাংলা ভাষা কোর্সেই বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। এক সময় এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সারি বিভাগে ভর্তি হওয়ার জন্য আসত। তবে এখন তাদের ভালোবাসা বাংলার প্রতি তৈরি হয়েছে।

গত ১০ বছর ধরে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বাংলা ভাষা কোর্স বাদে অন্যান্য বিভাগে বিদেশি শিক্ষার্থী আসার সংখ্যা ক্রমেই কমছে। গত চার সেশনে ভর্তি হয়েছে মাত্র ১২ জন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদেশি শিক্ষার্থীরা স্যার পি জে হার্টজ আন্তর্জাতিক হলের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ওই হলো কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয় ৫ জন, ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে ৩ জন, ২০১৫-১৬ বর্ষে ৩ জন এবং সর্বশেষ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয়েছে মাত্র ১ জন।

পি জে হার্টজ হলের প্রশাসনিক কর্মকর্তা জানান, হলে বর্তমানে ১৩২ জন বিদেশি শিক্ষার্থী রয়েছেন। তাঁদের অধিকাংশই বিভিন্ন মেডিকেল ও ভাষা শিক্ষা কোর্সে পড়াশোনা করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন সূত্রে জানা যায়, বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো নিজস্ব নীতিমালা নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমেই তাদের ভর্তি হতে হয়। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে বিদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা কোনো কার্যালয় না থাকায় ভর্তি হতে এসে হয়রানির শিকার হন তারা।

এদিকে দশটি ভাষা শেখাতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ৩টি ডিজিটাল ল্যাংগুয়েজ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হচ্ছে। ভাষার মাসে নেয়া হয়েছে এ উদ্যোগ। দশটি ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হবে বলে জানা গেছে। জানা যায়, 'লার্ন বাংলা' নামে রাজধানীর বনানীতে ২০১০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ভাষাকেন্দ্রিক এই সংগঠন। উদ্দেশ্য বিদেশিদের বাংলা ভাষা শেখানো। শুরু থেকে এখন পর্যন্ত এক হাজারের বেশি বিদেশি নাগরিক এখানে বাংলা ভাষা শিখেছেন। এখনো অনেকে শিখছেন।

শুধু দেশে নয়। বাংলা ভাষার এমন নিবিড় চর্চা চলছে জাপানের বিদেশি ভাষা শেখার অন্যতম বড় বিশ্ববিদ্যালয়, টোকিও ইউনিভার্সিটি অব ফরেন স্টাডিজে। ভিন দেশে বাংলা ভাষা শিখছে এখন ভিন দেশিরা। তাও যেনতেন ভাবে না, রীতিমত চার বছরের স্নাতক কোর্স। এখানে ২৭টি ভাষার মধ্যে আছে বাংলা ভাষায়ও শিক্ষা লাভের সুযোগ। ২০১২ সালে যাত্রা শুরু করে বাংলা বিভাগ। প্রতি বছর যেখানে ভর্তি হন ১০ জন করে শিক্ষার্থী।

স্টাফ রিপোর্টার

দৈনিক ইনকিলাব ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

প্রভাত ফেরি ফিরিয়ে দিন

মহান শহিদ দিবস ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির তৎকালীন পূর্ববাংলার মানুষের জীবনে এক ঐতিহাসিক ঘটনা যেমন, তেমনি বাংলার মানুষের রাজনৈতিক পরিণতি অর্থাৎ শোষণমুক্তির পথ-নির্দেশক সংগ্রামও বটে। ৫২-এর ছাত্র হত্যার রক্তধারা আমাদের পাকিস্তানি দুঃশাসনকে প্রতিরোধ ও প্রতিহত করবার সাহস জুগিয়েছে। তাই তো রাজনৈতিক ধারাপ্রবাহে আমরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে লাখো শহিদের রক্তের বিনিময়ে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে দখলদার পাকিস্তানিদের হাত থেকে পুনরুদ্ধার করতে পেরেছি।

একুশ আমাদের অহংকার। ঢাকায় গুলিবর্ষণে ছাত্রহত্যার খবর বাতাসের কানে কানে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছেছিল। এই একুশের চেতনা সেদিন কেবল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা ছাত্র সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। জালেম মুসলিম লীগ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের হিংস্র বাহিনী মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ ছাত্রদেরকে হত্যা করলেও সেই তরুণ ছাত্র সমাজই লীগশাহীর দুঃশাসনকে রুখে দিতে আন্দোলন শুরু করেছিলেন এবং সেই আন্দোলন গুলিবর্ষণের ফলে সমগ্র জাতিকে শোককাতর যেমন করল, তেমনি প্রতিরোধ স্পৃহার প্রবল শক্তিতে ঋদ্ধ করল সব মানুষকে।

তাই তো দেখেছি সেই দিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সব পেশার মানুষ দোকানপাট বন্ধ করে অফিস-আদালতের কাজ ছেড়ে দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং মেডিকেল কলেজে সংগ্রামী ছাত্র সমাজের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ লীগশাহীর বিরুদ্ধে কোনো আন্দোলনে নামতে যে ভয় বা শঙ্কায় পড়েছিলেন তার বিরুদ্ধে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এককভাবে ছাত্র সমাজ প্রমাণ করে দিল মাতৃভাষার দাবি কেবল তাদের একার নয়–এটা সকল মানুষের দাবি।

আমরা তাই দেখি ১৯৫৩ সাল থেকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রধান দাবিগুলো ছিল: ১. অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই। ২. সকল আঞ্চলিক ভাষার সমমর্যাদা চাই। ৩. সর্বস্তরে বাংলাভাষা চালু করা। ৪. রাজবন্দিদের মুক্তি চাই। এই স্লোগানগুলোর সঙ্গে যুক্ত হলো শহিদ স্মৃতি অমর হোক, এবং শফহদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না এবং খুনি নূরুল আমীনের ফাঁসি চাই। ঢাকার আদিবাসী যারা মুসলিম লীগের অন্ধ সমর্থক ছিলেন তারাও ছাত্রদের পাশে এসে দাঁড়ালো। ২১ ফেব্রুয়ারি গুলিবর্ষণের পরপরই ঢাকা আর্ট স্কুলের ছাত্ররা পটুয়া কামরুল হাসানের নেতৃত্বে অগণিত হাতে লেখা পোস্টার দিয়ে জনগণকে জানিয়ে দিয়েছিলেন এই রক্তপাতের কথা এবং তাদের দাবির কথা। বলতে দ্বিধা নেই, সেদিনকার ঢাকাবাসী আচানক দেখতে পেলেন ঢাকা শহরের সব নেড়ি কুকুরের গলায় লেখা খুনি 'নূরুল আমীন' আর গরুর টানা ময়লাবাহী যে গাড়িটি প্রত্যহ প্রত্যুষে ঢাকা শহরে চলাচল করতো তার পেছনে লেখা 'খাজা নাজিম উদ্দিনের গাড়ি'।

১৯৫৩ সাল থেকে ঢাকাসহ প্রতিটি জেলায় নগ্ন পায়ে প্রভাত ফেরি বেরুত এবং তারা নির্দিষ্ট স্থানে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন পুষ্পার্ঘ্যের মাধ্যমে। ঢাকায় দেখেছি রাতভর ছেলেমেয়েরা পাড়ায়, মহল্লায়, বাড়ির গ্যারেজে অথবা বারান্দায় বসে ফুলের মালা গাঁথছে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য। আর সূর্যোদয়ের আগেই পাড়ার ছেলেমেয়েরা একত্রে মিছিল নিয়ে চলেছে প্রথমে আজিমপুর কবরস্থানে, তারপর শহিদ মিনারে। মুখে তাদের প্রভাত ফেরির গান– মৃত্যুকে যারা তুচ্ছ করিল ভাষা বাঁচাবার তরে অথবা ভুলব না ভুলব না/একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না। এর পরের বছর থেকে যোগ হলো 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো ২১শে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি'। আবার ষাটের দশকে যুক্ত হয়েছিল 'ঘুমের দেশে ঘুম ভাঙাতে ঘুমিয়ে গেলো যারা' এই গানটি। এমনি করে শুধু ঢাকায় নয় ঢাকার বাইরেও বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা, এমনকি থানাতেও বিভিন্ন স্থানে শহিদ মিনার গড়ে ওঠল এবং সবাই তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করতে শুরু করলেন এইখানে।

একটি দুঃখের কথা স্মরণ করতে চাই, ২১ ফেব্রুয়ারি আসলেই ঢাকা শহরের দোকানপাটের সাইনবোর্ডে ইংরেজিতে লেখা যেসব ছোট ছোট কথাগুলো থাকত সেগুলোকে কালো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হতো। যারা তা করতেন না তারা ঢাকার তরুণ ছাত্রদের রোষানলে পতিত হতো। কিন্তু আজ মুক্ত স্বদেশে ৪৫ বছর পরে যখন এই কথাগুলো বলছি তখন ঢাকা শহরের বেশিরভাগ দোকানপাটের সাইনবোর্ড প্রধানত ইংরেজিতে লেখা, বাংলার কোনো বালাই নেই। আমাদের মধ্যে পঞ্চাশ-ষাটের দশকে যে সামান্য লজ্জাটুকু ছিল মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে আমরা যেন তা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়েছি। শুনলে অবাক হবেন, ২০১৩ সালে সরকার নাকি বাংলা ব্যবহারের নির্দেশ জারি করেছেন এবং মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন যে কোনো দোকানপাটের অনুমতি দেওয়ার সময় তাতে সিল মেরে দেন বাংলায় সাইনবোর্ড লিখতে হবে। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য সরকার বা করপোরেশনের নির্দেশ কেউ তোয়াক্কা করে না! দায়সারা গোছের নির্দেশ দিয়ে বাংলাভাষা সর্বত্র প্রচার করা যাবে না। নির্দেশ দেবার পর সেটি প্রতিপালিত হচ্ছে কি-না তা দেখতে হবে এবং খবরদারিও করতে হবে। অফিস আদালতে একই দৃশ্য। তবে সরকারি অফিসে বাংলার দুর্বোধ্য ব্যবহার কতটা শুদ্ধ বাংলা চর্চার সহায়ক তা আমার বোধগম্য নয়। এদিকে আদালতের কথা বলতে পারি–অধিকাংশ আর্জি ইংরেজিতে পেশ করা হয় এবং সর্বাত্মক শুনানি শেষে রায়টিও ঘোষিত হয় ইংরেজিতেই।

এখন অনেক বছর হলো প্রভাত ফেরি নেই, এখন আছে মধ্যরাতে শ্রদ্ধা নিবেদন। বাংলাভাষার জন্য যারা অকাতরে প্রাণ দিল তাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করা হচ্ছে ইংরেজিতে। এ ধরনের ঔপনিবেশিক মানসিকতা থেকে সরে এসে আমরা কি ৫০-৬০ দশকের মতো বাংলার মানুষের চর্চিত রীতি অনুযায়ী শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারি না? তাই আমার এবং আমাদের অনেকের দাবি–শহিদ স্মরণে প্রভাত ফেরি ফিরিয়ে দিন।

কামাল লোহানী

archive1.ittefaq ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭

ভাস্কর্যে মুক্তিযুদ্ধ

[গত সংখ্যার পর]

জাগ্রত চৌরঙ্গী

মুক্তিযুদ্ধের মহান শহীদদের অসামান্য আত্মত্যাগের স্মরণে নির্মিত ভাস্কর্য। ভাস্কর আবদুর রাজ্জাক জাগ্রত চৌরঙ্গীর ভাস্কর। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উদ্যোগে ১৯৭২-৭৩ সালে এটি নির্মাণ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় নির্মিত এটিই প্রথম ভাস্কর্য। ১৯৭১ সালের ১৯ মার্চের আন্দোলন ছিল মুক্তিযুদ্ধের সূচনা পর্বে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ। আর এই প্রতিরোধ যুদ্ধে শহীদ হুরমত উল্যা ও অন্য শহীদদের অবদান এবং আত্মত্যাগকে জাতির চেতনায় সমুন্নত রাখতে স্থাপন করা হয় দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য কর্ম জাগ্রত চৌরঙ্গী।

রি-ইনফোর্সড সিমেন্ট ঢালাইয়ে নির্মিত আঠারো ফুট উঁচু এ ভাস্কর্যটি ২২ ফুট উঁচু একটি বেদির ওপর প্রতিষ্ঠিত। দৃঢ়ভাবে ভূমির সঙ্গে আবদ্ধ দুই পায়ে স্থির অচঞ্চল দাঁড়িয়ে থাকা গ্রাম্য মুক্তিযোদ্ধার এই অবয়বধর্মী ভাস্কর্যটির এক হাতে রাইফেল অন্য হাতে উদ্যত গ্রেনেড। যে-কোনো আক্রমণ প্রতিরোধে প্রস্তুত এমন বোধের জন্ম দেওয়াই বোধহয় ভাস্করের উদ্দেশ্য ছিল। বেদির চারদিকে ২০৭ জন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার নাম লেখা রয়েছে। ভাস্কর্যটির শিল্পরীতি সম্পর্কে স্থপতি রবিউল হুসাইন বলেন, হয়তো সেটা গতিহীন, আরো দুর্বার শক্তিতে সঞ্চারিত হবার অপেক্ষা রাখে–এরকম সমালোচনা করা যায়। তবুও এটির উজ্জ্বল উপস্থিতিকে অস্বীকার করা যায় না। এটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রথম ভাস্কর্য।

সংশপ্তক

মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্যচর্চায় ভিন্ন মাত্রা যোগ করেন ভাস্কর হামিদুজ্জামান। তাঁর অন্যতম বড় মাপের কাজ 'সংশপ্তক'। সংশপ্তক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিতর্পণমূলক ভাস্কর্যগুলোর অন্যতম।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে এক পায়ের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে এ ভাস্কর্যটি। ১৯৯০ সালের ২৬ মার্চ এই ভাস্কর্যটি নির্মাণ করা হয়। এটি উদ্বোধন করেন তৎকালীন জাবির উপাচার্য অধ্যাপক কাজী সালেহ আহম্মেদ।

বেদির উচ্চতা ১৫ ফুট এবং মূল ভাস্কর্যের উচ্চতা ১৩ ফুট। মূল ভাস্কর্যটি ব্রোঞ্জ ধাতুতে তৈরি। এছাড়া এটি নির্মাণে লাল সিরামিক ইট ব্যবহার করা হয়েছে। ভাস্কর্যটির জ্যামিতিক ভঙ্গি এনেছে গতির তীক্ষ্ণতা।

১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ৩০ লক্ষ শহীদের তাজা প্রাণ ও দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে প্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল বাঙালি জাতি। তাদের এ আত্মত্যাগের বিনিময়ে জন্ম হয়েছে বাংলাদেশ নামে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। ১৯৭১ সালের বিজয় দিবসকে স্মরণ রাখার জন্য বিভিন্ন জায়গায় তৈরি করা হয় স্মৃতিস্তম্ভ। সেই রকম ভাবে বাঙালি জাতির এই গৌরব ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে ধরে রাখতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মাণ করা হয়েছে স্মারক ভাস্কর্য 'সংশপ্তক'। শিল্পী হামিদুজ্জামান খান ভাস্কর্যটিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ব্রোঞ্জের শরীরে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস, ঐতিহ্য ও চেতনাকে এতে দৃশ্যমান করা হয়েছে। 'সংশপ্তক' হলো ধ্রুপদী যোদ্ধাদের নাম। মরণপন যুদ্ধে যারা অপরাজিত। এ ভাস্কর্যটির মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যুদ্ধে শত্রুর আঘাতে এক হাত, এক পা হারিয়েও রাইফেল হাতে লড়ে যাচ্ছেন দেশমাতৃকার বীর সন্তান। মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করা যাদের স্বপ্ন, শত্রুর বুলেটের সামনেও জীবন তাদের কাছে তুচ্ছ। সংশপ্তকের গায়ে প্রতিফলিত হয়েছে ধ্রুপদী যোদ্ধাদের দৃঢ় অঙ্গীকার। যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয় জেনেও লড়ে যান যে অকুতোভয় বীর সেই সংশপ্তক। আগামী প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চেতনাকে দৃশ্যমান করার লক্ষেই 'সংশপ্তক' প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাছাড়া মহান মুক্তিযুদ্ধের অকুতোভয় বীরদের স্মরণেও এটি নির্মাণ করা হয়েছে। আরো অনেক পরে সংশপ্তক অনুসরণে ঢাকার পান্থপথে ইউটিসি সেন্টারে একটি ঝুলন্ত ভাস্কর্য তৈরি করেন শিল্পী হামিদুজ্জামান। স্টেনলেস ইস্পাতের সরু নলকে পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে নির্মিত এই ভাস্কর্যটিও অনবদ্য।

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম বহিরাঙ্গন ভাস্কর্যটি হল 'মুক্তিযোদ্ধা'।

অঙ্গীকার

চাঁদপুর শহরের মুক্তিযোদ্ধা সড়কের পাশের লেকে হাসান আলী সরকারি হাইস্কুল মাঠের সামনে একাত্তরেরশহীদ স্মরণে নির্মিত হয়েছে 'অঙ্গীকার'। বেদি থেকে ২২ ফুট ৭ ইঞ্চি উঁচু। সিমেন্ট, পাথর এবং লোহা দিয়ে তৈরি ভাস্কর্যটি।

ভাস্কর্যটির স্থপতি 'অপরাজেয় বাংলা'র ভাস্কর শিল্পী সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ। ১৯৮৮ সালে ভাস্কর্যটি স্থাপিত হয়। চাঁদপুরের তৎকালীন জেলা প্রশাসক এস এম শামছুল আলমের প্রচেষ্টায় ১৯৮৯ সালে দৃষ্টিনন্দন এ ভাস্কর্যটি উদ্বোধন করা হয়। একটি মুষ্টিবদ্ধ ভাস্কর্যটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। মুষ্টিবদ্ধ হাতে ধরা স্টেনগানে রয়েছে দৃঢ়তা ও প্রত্যয়ের প্রতিচ্ছবি। জ্যোৎস্না রাতে চাঁদের আলোয় অঙ্গীকারকে অপরূপ দেখায়।

স্বাধীনতা সংগ্রাম

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ভাস্কর্য এটি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোডে সলিমুল্লাহ হল, জগন্নাথ হল ও বুয়েট সংলগ্ন সড়ক দ্বীপে স্বাধীনতা সংগ্রাম ভাস্কর্যটি স্থাপিত। ১৯৫২-১৯৭১ সালের বিভিন্ন আন্দোলনে নিহত ১৮জন শহীদের ভাস্কর্য দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম ভাস্কর্যটি নির্মিত। সবার নিচে রয়েছে ভাষা শহীদের ভাস্কর্য এবং সবার উপরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাস্কর্য। লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের লাল সবুজ পতাকাটিও স্থান পেয়েছে শীর্ষে। ভাস্কর্যটির উচ্চতা ৬০ ফুট এবং পরিসীমা ৮৫.৭৫ ফুট।

মূল ভাস্কর্যকে বেষ্টিত করে আরো অনেক ভাস্কর্য নির্মিত হয়েছে সড়কদ্বীপে। শ্বেত শুভ্র রঙে গড়া মোট ১১৬টি ভাস্কর্যের সবকটিই শামীম শিকদারের তৈরি।

'নিতুন কুন্ডের ভাস্কর্য'

শাবাশ বাংলাদেশ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটক দিয়ে ঢুকলেই মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেরা ভাস্কর্যগুলোর একটি 'শাবাশ বাংলাদেশ' দেখতে পাওয়া যায়।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনের দক্ষিণে ১৯৯১ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়।

৪০ বর্গফুট জায়গা উপর ভাস্কর্যটি দাঁড়িয়ে আছে। রয়েছে দুজন বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রতিকৃতি। একজন রাইফেল উঁচু করে দাঁড়িয়ে আর তার বাঁ বাহুটি মুষ্টিবদ্ধ করে জাগানো। খালি গা, নগ্ন পা, লুঙ্গি পরা– যা গ্রামবাংলার যুবকের প্রতিনিধিত্ব করে। অন্যজন রাইফেল হাতে দৌড়ের ভঙ্গিতে রয়েছে। ১২ ফুট উচ্চতায়- শহুরে যুবকের প্রতীক। পরনে প্যান্ট, মাথায় এলোমেলো চুলের প্রাচুর্য যেন আধুনিক সভ্যতার প্রতীক।

এ দুজন মুক্তিযোদ্ধার পেছনে ৩৬ ফুট উঁচু একটি দেয়ালও দাঁড়িয়ে আছে। দেয়ালের উপরের দিকে এক শুন্য বৃত্ত যা দেখতে সূর্যের মতোই। ভাস্কর্যটির নিচের দিকে ডান ও বাম উভয় পাশে ৬ ফুট বাই

৫ ফুট উঁচু দুটি ভিন্ন চিত্র খোদাই করা হয়েছে। ডানদিকের দেয়ালে রয়েছে দুজন যুবক-যুবতীর চিত্র। যুবকের কাঁধে রাইফেল, মুখে কালো দাড়ি, কোমরে গামছা বাধা যেন এক বাউল প্রতিকৃতি। আর যুবতীর হাতে একতারা। গাছের নিচে মহিলা বাউলের ডান হাত আউলের বুকে। বাম দিকের দেয়ালে রয়েছে আরেক চিত্রপট। মায়ের কোলে শিশু, দুজন যুবতী একজনের হাতে পতাকা। গেঞ্জি পড়া এক কিশোর পতাকার দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। এই ভাস্কর্যটি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে কংক্রিট।

এটি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তরুণ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতীকী ভাস্কর্য। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের যে প্রতীকি ভাস্কর্যগুলো রয়েছে তার মধ্যে প্রকাশভঙ্গীর সরলতা, গতিময়তা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার তেজস্বী প্রকাশ এবং নন্দন তাত্ত্বিক দিক থেকে এই ভাস্কর্যটি অনবদ্য। স্বাধীনতার এক জ্বলন্ত সাক্ষ্য। ১৯৬৯ সালের গণ আন্দোলনের সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বলিষ্ঠ সাহসী ভূমিকা ছিল। ঘটনার আবর্তনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলেই তাতে জড়িয়ে পড়েন। অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহা শাহাদাৎ বরণ করেন।

মনির হোসেন মনি
sonelablog.com

‘ রোকনুজ্জামান খান দাদা ভাই স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতা ’
বিষয়: নৈতিকতা উন্নয়নে যুবসমাজের ভূমিকা

আয়শা সিদ্দিকা
সদস্য: ৯৩০/২০১১

প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত

[মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ২০১৮-'১৯ তে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত ৩টি রচনা নবীন পত্রিকায় ক্রমান্বয়ে প্রকাশের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবারের সংখ্যায় প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত রচনাটি প্রকাশ করা হলো]

‘এ বয়স জেনো ভীরু, কাপুরুষ নয়
পথ চলতে এ বয়স যায় না থেমে
এ বয়সে তাই
নেই কোনো সংশয়–
এ দেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।’

[আঠারো বছর বয়স–সুকান্ত চট্টাচার্য]

একটি দেশের যুবকদের নিয়েই যুবসমাজ। দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জনসমষ্টি এই যুবসমাজ। কারণ, শিশু, কিশোর, বৃদ্ধদের দিয়ে দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণ সাধিত হয় না। দেশের মুক্তি ও উন্নতির জন্য যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হয়। তাই শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড হলে, নৈতিকতা সম্পন্ন যুব সমাজ হল জাতির হৃৎপিণ্ড। তাই আদর্শ জাতি গঠন করতে হলে আগে জাতির যুবসমাজকে নৈতিকতা সম্পন্ন শিক্ষা দিতে হবে। পৃথিবীতে যত জাতি বা সম্প্রদায় ধ্বংস হয়েছে তার বেশিরভাগ জাতি বা সম্প্রদায় নৈতিকতা বিচ্যুতির কারণে। আমরা যদি পূর্বের আদ জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করতে চাই দেখা যাবে আদ জাতির ধ্বংসের মূল কারণ ছিল নৈতিক অধঃপতন। তাদের জাতির লোকেরা সমাজের সকল ধরনের নিকৃষ্ট কাজের সাথে জড়িত ছিল। পরবর্তীতে আমরা যদি রোমান সভ্যতার দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো তাদের পতনের মূল কারণগুলোর মধ্যে ছিল ভোগবিলাস ও অনৈতিক চরিত্র। তাই আমাদের জাতিসত্তাকে টিকিয়ে রাখতে বা আমাদের এই আধুনিক সভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আমাদের নৈতিকতার দিকে গুরুত্ব দেওয়া দরকার। আর এই নৈতিকতার উন্নয়ন ঘটাতে পারে আজকের এই যুবসমাজ।

নৈতিকতা কী : নৈতিক মূল্যবোধ বা নৈতিকতা মানুষের জীবনে অনুসরণযোগ্য এমন কিছু আচরণবিধি, যা মানুষের জীবন ব্যবস্থা ও জীবনপদ্ধতিকে করে তোলে সুন্দর, নির্মল ও রুচি স্নিগ্ধ। এর সাথে জড়িয়ে আছে সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, শিষ্টাচার, শ্রম, উত্তম চরিত্র, সৌজন্যবোধ, নিয়মানুবর্তিতা, অধ্যাবসায়, সর্বোপরি সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত হওয়া ইত্যাদি বিশেষ কতকগুলো গুন। নৈতিক মূল্যবোধ মানবচরিত্রকে করে তোলে সুষমামণ্ডিত। তাই মানুষের

আত্মিক সামাজিক উৎকর্ষের জন্যে এবং জাতীয় জীবনে উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার জন্যে সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের লালন, চর্চা ও বিকাশের বিশেষ গুরুত্ব নৈতিক মূল্যবোধের উৎসারণ এবং তার মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলা।

নৈতিকতা উন্নয়নে যুবসমাজের ভূমিকা : শিক্ষা রুপ মেরুদন্ড নিজের মহিমা প্রকাশের মাধ্যমে যুব সমাজকে আলোকিত করে। আলোকিত যুবসমাজ জাতিকে উন্নত করণের মাধ্যমে উৎকৃষ্ট জাতির রুপদান করে। অর্থাৎ যুবসমাজ জাতির ভবিষ্যৎ। সুতরাং কোন জাতির যুবসমাজ যদি নৈতিকতা ও মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে বিপথে ধাবিত হয়, তবে সেদেশের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাই নৈতিকতা উন্নয়নে যুবসমাজকেই হাল ধরতে হবে। নৈতিকতা বা নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়নে যুবসমাজের ভূমিকা নিচে আলোকপাত করা হল:

১. *নিয়মানুবর্তিতা বা শৃঙ্খলাবোধ:*

'যে সমাজে শৃঙ্খলা আছে, ঐক্যের বিধান আছে,
সকলের স্বতন্ত্র স্থান ও অধিকার আছে,
সেই সমাজেই পরকে আপন করিয়া লওয়া সহজ।'

-রবীন্দনাথ ঠাকুর

জগৎ শৃঙ্খলার জালে বাঁধা, নিয়মের জালে আটকানো। অনু থেকে অট্টালিকা পর্যন্ত, এই মহাবিশ্বে যা কিছু দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য সব কিছুই একটি বিশেষ সজ্জায় সাজানো, একটি বিশেষ শৃঙ্খলে বাঁধা। এই সজ্জা বা শৃঙ্খলাই নিয়ম। এ বিশ্বজগৎ নিয়মের অধীন। M.K. Gandhi বলেছেন, 'Discipline mairtains systems, systems mairtain development, development vibrates human life. So, discipline must be followed'.

আর এই নিয়মানুবর্তিতা যুবসমাজকে মেনে চলতে হবে, কারণ তারাই ভবিষ্যৎ জাতির কর্ণধার। নিয়মানুবর্তিতা উন্নয়নে যুবসমাজকে পালন করতে হবে নিম্নোক্ত ভূমিকা:

- পাঠ্য জীবনে যোগ্যতা অর্জন করে আত্মনিয়ন্ত্রণ শিক্ষায় যুবসমাজকে অভ্যস্ত হতে হবে।
- যুবসমাজ কর্তৃক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা ও হঠকারিতার পরিচয় দেয়াকে রীতিমত অপরাধ বলে গণ্য করতে হবে।
- আহার-বিহারে, কাজকর্মে, চাল-চলনে, আচার-অনুষ্ঠানে সর্বত্রই একটি সুসামঞ্জস্য শৃঙ্খলা প্রবর্তন করতে হবে।
- সুশৃঙ্খল মানুষকে সময়ানুবর্তীও হতে হবে। সময় কারো জন্য অপেক্ষা করে না। তাই যুবসমাজের নির্দিষ্ট সময়ে কাজ করা উচিৎ শৃঙ্খলার কথা স্মরণ করে দৈনিক কর্তব্য শেষ করা উচিৎ।
- জীবনের সর্বস্তরে তথা সামাজিক, পারিবারিক, রাষ্ট্রীয় জীবনে, খেলার মাঠে, কল-কারখানায়, অফিসে, দোকানে, ট্রেনে, বিমানে, হাসপাতালে, হোটেলে, কৃষিক্ষেত্রে, রেলে, স্কুলে-কলেজে, ঘরে-বাইরে সর্বত্রই যুবসমাজকে নিয়মানুগত্যের আদর্শ স্থাপন করতে হবে। তাদের লক্ষ্যে স্থির থাকতে হবে।

সুপরিকল্পিত এবং সুসামঞ্জস্য নিয়মাবলীর অধীনে যুবসমাজ তাদের ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনে কাঙ্খিত সফলতা নিয়ে আসতে পারে। যুবসমাকেই যদি নিয়ম ভঙ্গের মরণ-যজ্ঞ চলতে থাকে তাহলে তার জন্যে ভবিষ্যতের গোটা সমাককেই চরম মাশুল দিতে হবে। পরবর্তী জীবনে যুবসমাজই এক দায়িত্বশীল নাগরিক তাই যুব সমাজের কাছে এই নিয়মানুশীল এক মহৎ কর্তব্য।

২. *শিষ্টাচার ও সৌজন্য:*

শিষ্টাচারমানব চরিত্রের সর্বোত্তম গুন। ব্যক্তির চাল, চলনে, কথা-বার্তায়, আচার-ব্যবহারে যখন একটি শালীনতা ও সৌজন্যবোধ ফুটে উঠে তখন তাকেই শিষ্টাচার বলে আখ্যায়িত করা হয়। শিষ্টাচার জীবনকে দেয় সৌরভ, চলার পথকে করে সুগম ও সুন্দর। দেহের সৌন্দর্য অলঙ্কার কিন্তু আত্মার সৌন্দর্য শিষ্টাচার। আর সৌজন্য বলতে বাইরের মার্জিত ব্যবহারই শুধু নয়, নয় ভদ্রতার সামাজিক রীতি অনুসরণ, এর সঙ্গে যুক্ত আছে সুজনের মহৎ হৃদয়ের গভীর উষ্ণ স্পর্শ। আছে অন্তর-সৌন্দর্যের বিকাশিত মহিমা।

Oscar Wilde তাঁর 'The Importance of Being Earnest' নাটকে বলেছেন, 'courtesy and politeness are the basic principle which directs human life smoothly.' আর যুবসমাজের উপরই নির্ভর করে তাদের পরবর্তী জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা। নির্ভর করে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের গতি-প্রকৃতি। যুবসমাজ তাদের শিষ্টাচার ও সৌজন্য উন্নয়নে পালন করতে পারে নিম্নোলিখিত ভূমিকা:

- যুবসমাজ পারে অন্যের মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে বিনম্র ব্যবহার দেখাতে।
- অন্য ব্যক্তির সাথে কাজ করার সময় বা আচার-ব্যবহার করার সময় মার্জিত বা ভদ্রোচিত ব্যবহার করা।
- বড় ও বয়স্কদের সম্মান করা।
- সকলকে আচরণে তুষ্ট করা।
- ঔদ্ধত্যকে পরিহার করা এবং সবার সঙ্গে প্রীতিময় সম্পর্ক গড়ে তোলা।
- মার্জিত ও সুন্দর মনের পরিচয় দেওয়া।
- কথাবার্তায় ও আচার-আচরণে বিনীয় ও নম্র হওয়া।

শিষ্টাচারকে নির্বাসন দিয়ে মানবসভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব নয়। উন্নত সভ্যতা তো এরই অবদারপুষ্ট। শিষ্টাচার কোন অর্থ বা ঐশ্বর্য দিয়েই কেনা যায় না। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য তুলে ধরা যায়–'যাকে কিছু দেওয়া যায় না, তাকেও যদি একটি জিনিস দেয়া যায়, সেটা সৌজন্য।'

আলো-হাওয়া না পেলে কুঁড়ি যেমন প্রস্ফুটিত হতে পারে না, শিষ্টাচার ও সৌজন্যের অভাব ও ঠিক তেমনি যুবসমাজের প্রকৃত আদর্শকে ব্যর্থ করে দেয়। যুবসমাজকেই শিষ্টাচার ও সৌজন্য উন্নয়নে আদর্শ স্থাপন করতে হবে, পালন করতে হবে যুগান্তকাপরী ভূমিকা।

৩. *সততা :*

যেসব গুণ মানবচরিত্রকে মহিমান্বিত করে তোলে সততা তার মধ্যে একটি মূল্যবান গুণ, যার মধ্য দিয়ে মানুষ নিজেকে আবিস্কার করে, মনুষ্যত্বকে অর্জন করে। সততা মানুষকে খাঁটি সোনার মতো নিখাদ করে তোলে ফলে সততা জীবনকে সার্থক করার একটি চমৎকার পঙ্খি ও মানবচরিত্রের উজ্জ্বল অলঙ্কার। কবি শেখ সা'দী বলেন- 'সততার পরিপুষ্টি সকলের দাবি, সততার শ্রেয়স্কর লব্দ ভাবি,

দিকভ্রান্ত অসতাতা, কালজয়ী সততা।'

তাই সততার উন্নয়নে যুবসমাজকে অবশ্যই

- সততা উন্নয়নে যুবসমাজকে অবশ্যই
- সত্যবাদিতার মাধুর্যে নিজেকে মণ্ডিত করতে হবে।
- অন্যায়ের মাধ্যমে বা অবৈধ উপায়ে বিত্তশালী হওয়ার চেষ্টা থেকে নিজেকে বিরত রাখবে।
- সততা ও সত্যবাদিতার অনুশীলন করবে এবং জীবনে তার প্রতিফলন ঘটিয়ে যথার্থ মনুষ্যত্বের অধিকারী হতে চেষ্টা করবে।
- ন্যায়ের পথে সমুজ্জ্বল থাকবে।
- মহামানবের সততার পথ, আদর্শের পথ অনুসরণ করবে।
- জীবনের প্রতিটি স্তরে সততার আদর্শ বা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

যুবসমাজের মধ্যে সততা না থাকলে স্নেহ-প্রেম-প্রীতি, দয়া-মায়া, আবেগ-অনুকম্পা সবই লোপ পাবে। পৃথিবী হয়ে উঠবে বিষ্ণময়। সুতরাং, সততার চেয়ে বড় গুণ পৃথিবীতে আর নেই।

৪. অধ্যবসায়:

মানব জীবনের এক মহৎ গুনের নাম অধ্যবসায়। অধ্যবসায় হচ্ছে কতিপয় গুনের সমষ্টি। চেষ্টা, উদ্যোগ, আন্তরিকতা, পরিশ্রম, ধৈর্য ইত্যাদি গুনের সমন্বয়ে অধ্যবসায় পরিপূর্ণতা লাভ করে। কোন কাজে ব্যর্থ হওয়ার পরও সফলতার জন্য পুনঃ পুন চেষ্টা করার নামই 'অধ্যবসায়'। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন–

'কোন কাজ ধরে যদি উত্তম সে জন
হউক সহস্র বিঘ্ন ছাড়ে না কখন'।

তাই অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত স্থাপনে যুবসমাজকে–

- নিরন্তর সাধানার দ্বারা জীবনকে পরিপূর্ণ করে তুলতে হবে।
- মনের আস্থা ও বিশ্বাসকে বাস্তব রূপদানের জন্য সুদৃঢ় সংকল্প নিয়ে চেষ্টার পুনারাবৃত্তি করতে হবে।
- ব্যর্থতার সিঁড়ি অতিক্রম করতে হবে।
- ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য কাজের আগ্রহ, সুদৃঢ় সংকল্প, বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ ঘটাতে হবে।
- একনিষ্ঠ সাধনা, কর্মনিষ্ঠা ও সংগ্রামী প্রেরনায় উজ্জীবিত হতে হবে।
- অবিচল ধৈর্য, শ্রম ও আত্মবিশ্বাসের উপর ভর করে এগিয়ে যেতে হবে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে।
- অলসতা ও শ্রমবিমুখতা পরিহার করতে হবে।
- জীবনের রুদ্ধ দুয়ার খুলতে হলে বারবার আঘাত হানতে হবে; পরিশ্রম করতে হবে আর সময়কে কাজে লাগাতে হবে।

আত্মশক্তির বলে বলীয়ান হলে জীবনের সাফল্য অনিবার্য। জীবন ফুলশয্যা নয়। জীবন দুর্গম ও বাধাবিঘ্নময়। যুবসমাজকে অধ্যবসায়ের দ্বারা সব বাধাবিঘ্ন দূর করে অধ্যবসায় নামক নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

৫. উত্তম চরিত্র:

চরিত্রের মত শ্রেষ্ঠ ও গৌরবজনক সম্পদ মানবজীবনে আর কিছুই নেই। অর্থ, চরিত্র। চরিত্র বলতে। কেজন মানুষের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, ধর্মবোধ, ন্যায়বোধ ইত্যাদির সমন্বয়কে বোঝায়। চরিত্রই মানুষকে ইতর প্রাণী থেকে উন্নততর আসন দান করে। তাই উত্তম চরিত্র গঠনে যুবসমাজকে–

- অমার্জিত আচরণ, লোভ হিংসা-দ্বেষ ও অহংকারের উর্দ্ধে উঠে নীতি ও মূল্যবোধের পরিচর্যা করে জীবনযাপন করতে হবে।
- সচ্চরিত্র সাধনার ধন। চরিত্র বহুদিনের সাধনার বলে অর্জন ও রক্ষা করতে হয়। সচ্চরিত্রে বলীয়ান যুবসমাজ হাজার প্রলোভন সত্ত্বেও সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হবেন না।
- সর্বদাই যুবসমাজকে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে।
- মহামানবদের আদর্শ অনুসরণ করে উন্নত চরিত্র গঠনে তৎপর হবে।
- শত বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করবে।
- নীতিজ্ঞানকে জীবনরে শ্রেষ্ঠ পথের হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।
- উত্তম চরিত্র গঠনে যুবসমাজ কখনই আদর্শ হতে বিচ্যুত হবে না, ক্রোধে আত্মহারা হবে না, অন্যায়কে প্রশ্রয় দিবে না, নিষ্ঠুর আচার-আচরণ করবে না।

জগতে অমরত্ব লাভ করার জন্য দরকার উত্তম চরিত্র। এ কারণে বলা হয়–'Characters is the crown and glory of human life.'

যুবসমাজ এ মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে সচ্চারিত গঠনে তৎপর হবে।

৬. শ্রম :

মানুষের জন্য শ্রম ব্যতিরেকে কিছুইনে নেই। সকল কীর্তিই শ্রমের দ্বারা আরদ্ধ। জ্ঞানীর জ্ঞান, বিজ্ঞানীর অত্যাশ্চর্য আবিস্কার, ধর্ম সাধকের আত্মোপলব্ধি, ধনীর ধনৈশ্বর্য সবকিছুই শ্রমলব্ধ জিনিস। পরিশ্রমের যোগ্য মূল্যায়ন পরিশ্রমকারীকে উৎসাহিত করে থাকে। তাই Virgil বলে 'The dignity of labour makes a man self-confident and high ambitious. So, the evaluation of labour is essential.'

তাই এই শ্রমের সর্যাদাকে যুবসমাজই পারে ভালভাবে উপলব্ধি করতে। তাই শ্রমের মর্যাদাকে ত্বরান্তিতকরণে যুবসমাজ রাখতে পারে নিম্নোক্ত ভূমিকা:

- যুবসমাজ পারে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে।
- শ্রমের যোগ্য মূল্যায়ন করা।
- কায়িক শ্রমের প্রতি জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে জাতির হাল ধরতে শিখানো। জনগণকে পরিশ্রমী করে তুলতে উদ্বুদ্ধকরণ।
- শ্রম, কঠোর সাধনা বা নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবনকে সার্থক, সুন্দর ও তাৎপর্যময় করে তুলতে চেষ্টা করা।
- আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী এবং শ্রমের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে।
- শ্রমজীবী মানুষ সর্বদাই যুবসমাজ কর্তৃক সম্মানিত হবে।
- ধর্মগ্রন্থ, উন্নত দেশের শ্রমের দৃষ্টান্ত যুবসমাজকে অনুপাণিত করবে এবং যুবসমাজ এসব দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উন্নত জীবন গঠনে সোচ্চার হবে।
- অন্ধ অহমিকাবোধ দূরীভুত করে জীবনে ত্যাগ ও আত্মপ্রত্যয়

প্রতিষ্ঠায় বলীয়ান হবে যুবসমাজ।

পরিশ্রম না করে পরনির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকার মধ্যে কোন মর্যাদা নেই। তাই জীবনসংগ্রমে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, শ্রম সাধনায় আত্মনিযোগ করতে হবে যুবসামাজকে। অন্যথায়, যুবসমাজ কর্তৃক জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়।

৭. *জনসেবা* :

মানুষ সামাজিক জীব। অন্যের সাহায্য ছাড়া কেউ জীবনধারণ করতে পারে না। তাই অন্যের বিপদে-আপদে নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য বা সেবা করার নামই জনসেবা। মানবপ্রেমের সঞ্জীবনীমন্ত্রে শিক্ষাভাল করে স্বামী বিবেকানন্দ সারা বিশ্ব মানব প্রেম প্রচার করেছেন। তাঁর অমর বাণী:

'জীবে প্রেম করে সেইজন,
সেইজন সেবিছে ইশ্বর।'

জনসেবা নামক নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়নে যুবকসমাজই পারে যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিতে।'

- জগতের আপামর জনসাধারণকে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে বেঁধে তাদের মঙ্গল সাধনের চেষ্টা ও সেবা করা।
- অন্যো রোগ-শোক, জরা-ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখ দূর করতে নিজের সুখ, ঐশ্বর্য ত্যাগ করা।
- একই স্রষ্টার রাজ্যে বাস করে পরস্পর ভোদাভেদ ভুলে গিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও সাম্যনীতির ভিত্তিতে জনসেবায় আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা।
- পরোপকারের মহান ব্রতে মনকে উদ্দীপিত করা।
- ধর্মীয় চেতনা ও ধর্মগুরু, ধর্মপ্রবক্তার আলোকে জীবনকে সাজানো।

৮. *সহিষ্ণুতা* :

'ধৈর্য ধর, ধৈর্য ধর, বাঁধ বাঁধ বুক
সংসার সহস্র দুঃখ আসিবে আসুক'

যে দুর্লভ গুণ মানুষের কণ্ঠে পরিয়েছে বিজয়ীর বরণমালা, দিয়েছে বক্ষ বিস্তৃত সাহস, শুনিয়েছে অমরত্বের মন্ত্র এবং যা তার জীবনযুদ্ধে সংগ্রামের কবচকুণ্ডল, তা হল সহিষ্ণুতা উন্নয়নে যুবসমাজ পারে–

- নানা সংঘাতে, দুঃখে দৈন্যে, বিপদে-আপদে স্থির থাকতে।
- জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করতে সাহসী ও সহনশীল হতে।
- কান্ত চিত্তে প্রতিকূলতাকে জয় করতে।
- সহিষ্ণু মহাপুরুষ, প্রতিভাবান, অভিযাত্রীর জীবনে র মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া।

৯. *দয়া* :

ইংরেজ কবি Wordsworth লিখেছেন : 'That best portion of good man's life His little, nameless, unremembered acts of kindness and of love.'

বাংলায় প্রবাদেও আছে 'হিংসার অধিক পাপ নেই, দয়ার অধিক ধর্ম নেই'। দয়া মানুষের একটি মহৎ গুণ। আর এই গুণের উন্নয়নে যুবসমাজ পারে।

- পরম আন্তরিকতার সঙ্গে দয়া পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে দয়া দেখানো।
- যুবসমাজ কর্তৃক দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে যেন কোনভাবেই গর্ব বা আহংকার প্রকাশ না পায়।
- ও সাহায্য-সহযোগিতদয়া-দাক্ষিন্যার ক্ষেত্রে বিচার-বিবেচনা প্রয়োজন। কারণ যারা দয়া পাওয়ার যোগ্য নয় তাদেরকে দয়া দেখালে তারা অলস ও অকর্মন্য হয়ে পড়বে।

১০. *মহত্ত্ব* :

'মহৎ যে হয় তার সাধু ব্যবহার'। কথাটি দ্বারা কবি একজন মহৎ মানুষের মূল্যায়ন করেছেন, অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন যে, সাধু ব্যবহারের দ্বারা একজন মানুষের মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়ে থাকে। আর এই মহত্বের উন্নয়নে যুবসমাজ পারে–

- আত্মচিন্তায় নিমগ্ন না থেকে পরের মঙ্গলের জন্যে বা দেশ ও দশের হিতার্থে আত্মোৎসর্গ করতে।
- হীনতা, দীনতা, সংকীর্নতা, স্বার্থপরতা, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি দোষ থেকে দূরে থাকা।
- সর্বদা সকল মানুষের মঙ্গল চিন্তা করা এবং কাজের মধ্য দিয়ে মঙ্গল ও কল্যাণ সাধন করা।
- কীভাবে দেশের মঙ্গল হবে, কীভাবে দেশের মানুষের কল্যাণ সাধিত হবে সে সম্পর্কে নিজেদের ব্যাপৃত রাখা।
- শুধু নিজেদের কথা না ভাবা, নিজেদের ভালো-মন্দের দিকে লক্ষ না রাখা।
- মানুষের বৃহত্তর কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করা এবং সে সাধনায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ব্রতী থাকা-বিচ্যুত না হওয়া।
- মহৎ মানুষের মহত্ত্বে উজ্জীবিত হয়ে মহৎ কর্ম সাধনে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হওয়া।

উপসংহার: বর্তমানে আমাদের সমাজ জীবনে চরম অবক্ষয়ের চিত্র জীবন্ত হয়ে আছে। এ অবক্ষয় যুবসমাজকেও প্রভাবিত করছে, দোলা দিচ্ছে তাদের মন-মানসিকতাকে। আজ আমাদের যুবসমাজের সামনে কোন আদর্শ নেই। নেই অনুপ্রানিত করার মত কোন মহৎ প্রাণ মানুষ। আর তাই যুবকদের সুসংগঠিত করে সত্য এবং ন্যায়ের পথে পরিচালিত করতে হলে তাদের মধ্যে নীতিজ্ঞান ও সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে হবে। তারা সচেতন হলে কোন রকম অন্যায় কুমন্ত্রনা তাদেরকে বশীভূত করতে পারবে না। যুবকরই দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এবং জাতির কর্ণধার। তাদের মনে এ চেতনা বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। একইসাথে তাদের কণ্ঠে তুলে দিতে হবে কবি সুকান্তের বাণী–

'এসেছে নতুন শিশু, তাকে ছেড়ে দিতে হবে স্থান,
জীর্ণ পৃথিবীতে ব্যর্থ, মৃত আর ধ্বংসস্তূপ-পিঠে
চলে যেতে হবে আমাদের ।
চলে যাব-তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি–
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।'

অক্সফোর্ড স্টুডেন্ট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশের আনিশা

যুক্তরাজ্যের বিশ্বখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠন অক্সফোর্ড স্টুডেন্ট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশের মেয়ে আনিশা ফারুক। বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত পর্বের ভোটাভুটিতে সর্বোচ্চ ১ হাজার ৫২৯ ভোট পেয়ে স্বনামধন্য ওই সংগঠনটির শীর্ষ পদে বিজয়ী হন তিনি। আনিশা ২০১৯-২০ মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

অক্সফোর্ড স্টুডেন্ট ইউনিয়নের ইতিহাসে আনিশা প্রথম কোনো বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রেসিডেন্ট। আনিশার বাবা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর ফারুক আহমদ। তাঁদের বাড়ি বাংলাদেশের ভোলা জেলার চরফ্যাশন উপজেলায়। আনিশা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিষয়ে স্নাতক তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় নানা কারণে বিশ্বে স্বনামধন্য। বিশ্বে যুগান্তকারী অবদানের শীর্ষ স্বীকৃতি নোবেল বিজয়ীদের ২৮ জন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। এটিকে বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে মনে করা হয়।

আনিশা ফারুক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় শাখা লেবার ক্লাবের (লেবার পার্টির আদর্শে বিশ্বাসী শিক্ষার্থীদের সংগঠন) কো-চেয়ার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্টুডেন্টস ইউনিয়নের ক্রুটিনি কমিটি মেম্বার ছিলেন। ডিবেট সোসাইটি অক্সফোর্ড ইউনিয়নের স্ট্যান্ডিং কমিটিতে কাজ করেছেন। পাশাপাশি স্থানীয় কাউন্সিলগুলোর সঙ্গে নানা নীতি প্রণয়নে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে তাঁর। নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের সরাসরি বিতর্কে আনিশা ফারুক বলেন, শিক্ষার্থীদের অধিকার নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে তিনিই অন্যান্য প্রার্থীর তুলনায় বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন। বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে তিনি বলেন, তাঁর চাইতে ভালো কোনো প্রার্থী থাকলে তিনি নিজে আর প্রার্থীই হতেন না।

প্রেসিডেন্ট এবং চারজন ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়ে স্টুডেন্ট ইউনিয়নের সাব্বাটিকেল টিম বা শীর্ষ কমিটি। এরপর আছে ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব স্টুডেন্টস (এনইউএস) ডেলিগেটস এবং স্টুডেন্ট ট্রাস্টি। সব কমিটিতেই আনিশার নেতৃত্বাধীন গ্রুপ অক্সফোর্ড ইমপ্যাক্টের প্রার্থীরা ভালো ফল করেন। এ ছাড়া শিক্ষার্থীরা একটি চ্যারিটি সংগঠনকেও ভোটের মাধ্যমে বাছাই করেন, যার জন্য তাঁরা কাজ করবেন।

অক্সফোর্ড স্টুডেন্ট ইউনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতি প্রণয়নে শিক্ষার্থীদের পক্ষে ভূমিকা রাখে। জাতীয় উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম নীতিবিষয়ক বিতর্কেও এই সংগঠন সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

প্রসঙ্গত, অক্সফোর্ড স্টুডেন্ট ইউনিয়ন এবং অক্সফোর্ড ইউনিয়ন দুটি ভিন্ন সংগঠন। অক্সফোর্ড ইউনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়টির একটি ডিবেটিং সোসাইটি, যারা বৈশ্বিক নানা বিষয়ে বিতর্কের আয়োজন করে। আর অক্সফোর্ড স্টুডেন্ট ইউনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে।

প্রথম আলো ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

বাংলাদেশের তরুণদের নাসার অ্যাপস চ্যালেঞ্জ জয়ের গল্প

যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার 'ইন্টারন্যাশনাল স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ' প্রতিযোগিতার একটি ক্যাটেগরিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) 'অলিক' দল ।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া, মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর ও জাপানের তিনটি দলকে হারিয়ে এই গৌরব অর্জন করে দলটি। 'বেস্ট ইউজ অব ডাটা' ক্যাটেগরিতে চ্যাম্পিয়ন হয় তারা। এমন বিজয়ের স্বাদ এই প্রথম পেল বাংলাদেশ।

এছাড়া 'বেস্ট ইউজ অব হার্ডওয়ার' ক্যাটেগরিতে শীর্ষ দশ-এ জায়গা করে নিয়েছে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের দল 'প্ল্যানেট কিট'। এর আগে সর্বোচ্চ অর্জন ছিল 'পপুলার চয়েজ' ক্যাটেগরিতে শীর্ষ ১০-এ থাকা। ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি সেই সাফল্য পেয়েছিল।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় নাসায় যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন 'অলিক'-এর চার সদস্য ও তাঁদের মেন্টর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বিশ্বপ্রিয় চক্রবর্তী।

সেরা হওয়ার গল্প

ডয়চে ভেলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে নিজেদের সেরা হওয়ার গল্প শুনিয়েছেন 'অলিক'-এর ক্যাপ্টেন আবু সাবিক মাহাদী। তিনি বলেন, 'প্রথমবার ২০১৬ সালে আমরা দুইজন এটাতে অংশ নিয়েছিলাম। কিছু করতে পারিনি। ২০১৭ সালে অংশই নিইনি। প্রস্তুতি নিয়েছিলাম ২০১৮ সালের প্রতিযোগিতার জন্য। তবে এবার টিমে দুই জন নয়, ছিলাম চারজন। সবাই মিলেই এবার জিতেছি নাসার 'স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জ'। আর আমাদের সঙ্গে মেন্টর হিসেবে ছিলেন বিশ্বপ্রিয় স্যার ।'

তিনি বলেন, তাঁদের প্রকল্পের নাম ছিলো 'লুনার ভিআর'– যা একটি ভার্চুয়াল রিয়েলিটি অ্যাপ। নাসা প্রদত্ত বিভিন্ন ডাটা ব্যবহার করে এই অ্যাপটি তৈরি করা হয়েছে। অ্যাপটির মাধ্যমে নাসা আপোলো ১১ মিশনের ল্যান্ডিং এরিয়া ভ্রমণ, চাঁদ থেকে সূর্যগ্রহণ দেখা এবং চাঁদকে একটি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ভার্চুয়ালভাবে আবর্তন করা যাবে, যেটা ভবিষ্যতে শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় কাজে আসবে।

আবু সাবিক মাহাদী শাবিপ্রবির ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিভাগের ২০১৩-২০১৪ সেশনের শিক্ষার্থী। দলের অন্য তিন সদস্য হলেন, একই বিভাগের একই ব্যাচের শিক্ষার্থী কাজী মঈনুল ইসলাম, একই বিভাগের ২০১৫ -২০১৬ সেশনের শিক্ষার্থী সাব্বির হাসান ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৩-২০১৪ সেশনের এস এম রাফি আদনান।

মেন্টর শিক্ষক হিসেবে ছিলেন শাবিপ্রবির কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বিশ্বপ্রিয় চক্রবর্তী।

নওগাঁ জেলার কোমায়গাড়ির ছেলে আবু সাবিক মাহদী নটরডেম কলেজ, বগুড়া জেলার নেপালতলীর ছেলে কাজী মঈনুল ইসলাম বগুড়ার সরকারি আজিজুল হক কলেজ, সাতক্ষীরা জেলার কোমরপুরের ছেলে এস এম রাফি আদনান ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ ও জামালপুর জেলার ভোকেশনাল মোড়ের ছেলে সাব্বির হাসান জামালপুরের সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ থেকে এইসএসসি পাস করে শাবিপ্রবিতে ভর্তি হন।

অলিকের মেন্টর অধ্যাপক বিশ্বপ্রিয় চক্রবর্তী ডয়চে ভেলেকে বলছিলেন, 'এই প্রতিযোগিতার খবর আমরা জানতাম। নাসার হয়ে বাংলাদেশে কাজ করে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়ার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস–বেসিস। আমাদের টিম সেখানে অনেকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। বেসিস শীর্ষ আটটি টিমকে সিলেক্ট করেছিল। তার মধ্যে আমরাও ছিলাম। সেখান থেকে নাসার মূল প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে আমরা চ্যাম্পিয়ন হই। এটা বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে দারুণ সাড়া ফেলবে বলেই আমার বিশ্বাস ।'

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

টিমের পরবর্তী লক্ষ্য সম্পর্কে আবু সাবিক মাহাদী জানান, ভার্চুয়াল রিয়েলিটি, গেম এবং ভিস্যুয়াল ইন্টারএক্টিভ নিয়ে ভবিষ্যতে আমাদের কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে। তিনি বলেন, 'আসলে আমরাই তো নতুন । কিন্তু আমরা শুরু থেকেই অনেক বেশি জানার চেষ্টা করেছি এবং এখনো করছি কীভাবে আমরা আন্তর্জাতিক মানের অ্যাপস তৈরি করতে পারি। এক্ষেত্রে আমাদের নিজেদের গন্ডি থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করেছি। নিজেরাই নিজেদের কাজকে সমালোচনা করেছি এবং অন্যদেরও সমালোচনার সুযোগ দিয়েছি। আমরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত ইন্ডিপেন্ডেন্ট গেম স্টুডিওর কাজ দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছি। তরুণ যারা কাজ করতে চায় তাদের উচিত লেগে থাকা। তাছাড়া বাংলাদেশ সরকারকে বলবো, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাগুলোতে বাংলাদেশের অবস্থান বেশ ভালো। আমাদের উচিত, স্কুল পর্যায় থেকেই ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন বিষয়ে জানতে আগ্রহী করে তোলা, তাহলে ভালো ফল মিলবে।'

সরকারের প্রতিক্রিয়া

ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ডয়চে ভেলেকে বলেন, 'মন্ত্রী হওয়ার আগে আমি যখন বেসিসের সভাপতি ছিলাম তখন এই উদ্যোগটা নেই। এর আগেও ব্যক্তি পর্যায়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া হতো। আমি নিজে নাসার সঙ্গে কথা বলে বেসিসকে সম্পৃক্ত করেছি। নাসায় একজন বাঙালি আছেন। তিনি এ ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। বাংলাদেশের তরুণরা যে ট্যালেন্টেড সেটা এই প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে আবারও প্রমাণিত হয়েছে । এটা প্রমাণ হওয়ার দরকার ছিল। এখন অন্য শিক্ষার্থীরাও এ ব্যাপারে উদ্যোগী হবে। আমরা অভিভাবক হিসেবে যেটা পারি, সেটা হচ্ছে, তাদের পথটা তৈরি করে দিতে। সেই কাজটাই আমরা করেছি। তরুণরা তাদের মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে নিজেদের প্রমাণ করেছে।'

নিজেদের আয়োজন আর বাংলাদেশের অর্জন নিয়ে বেসিস সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবীর ডয়চে ভেলেকে বলেন, 'নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জে ৭২টি দেশ থেকে দুই হাজার ৭৯৫টি দল অংশগ্রহণ করেছিল। শুধুমাত্র বাংলাদেশ থেকে শতাধিক দল অংশগ্রহণ করে। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নসহ সেরা দশের খেতাব অর্জনে সক্ষম হয়েছে আমাদের সন্তানরা। এতে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের দেশে ট্যালেন্টের অভাব নেয় । এর আগেও বাংলাদেশ থেকে অনেকবার নাসা স্পেস অ্যাপস চ্যালেঞ্জে অনেকগুলো দল অংশগ্রহণ করেছিল। আসন্ন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে সামনে রেখে এ অর্জন সত্যি বাংলাদেশকে বিশ্বব্যাপী নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, এআর, ভিআর, ব্লকচেইনসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করতে আমাদের সন্তানরা প্রস্তুত।'

সমীর কুমার দে
dw.com ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

প্রকল্প সংবাদ

মেধা লালন প্রকল্প'র ২০১৮ ব্যাচের অবহিতকরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত মেধা লালন প্রকল্প (Talent Assistance Scheme-TAS)-এর ২০১৮ ব্যাচের নবনির্বাচিত সদস্যদের জন্য গত ০৭-০৮ মার্চ ২০১৯ এক অবহিতকরণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার 'পদক্ষেপ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট' মিলনায়তনে। মেধা লালন প্রকল্প'র লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গুরুত্বপূর্ণ

নিয়মকানুন সম্পর্কে নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অবহিত করা, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করা এবং ফাউন্ডেশনের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে তাদেরকে ধারণা প্রদান–এসবই ছিল এ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে উক্ত ব্যাচের ২৯ জন ছাত্র এবং ২৯ জন ছাত্রী অর্থাৎ মোট ৫৮ জন সদস্য অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের প্রথম দিন (০৭ মার্চ বিকাল ৪টায়) নবনির্বাচিত সদস্য ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন, যাতায়াত ভাতা প্রদান, অনুষ্ঠান সম্পর্কিত উপকরণ বিতরণ করা হয়। এরপর প্রোগ্রাম অফিসার নাসিমা সুলতানা প্রকল্প'র অবশ্য পালনীয় নিয়মকানুনগুলো বুঝিয়ে বলেন। এইচএসসি পরীক্ষায় কীভাবে ভালো ফলাফল করা যায় এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনামূলক আলোচনা করেন প্রকল্পে'র বর্তমান সদস্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে অধ্যয়নরত TAS এর ২০১৪ ব্যাচের সদস্য মো. আবদুল্লাহ আল মামুন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে অধ্যয়নরত ২০১৫ ব্যাচের আবদুল্লাহ সাদমান জামী এবং সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস অধ্যয়নরত ২০১১ ব্যাচের হোছাইন মোহাম্মদ জুনাইদ আনসারী। তারা এইচএসসি পড়ুয়া নবীন সদস্যদের প্রতি এই পর্যায়ের পুরো সময়টুকু খুব ভালোভাবে পাঠ্যবই এবং সাধারণ জ্ঞানের উপর নিয়মিত পড়াশোনা করে, দৃঢ় আত্মবিশ্বাস বজায় রেখে এবং লক্ষ্য অটুট রেখে সামনে এগিয়ে যেতে পরামর্শ প্রদান করেন। তারা নবীনদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরও দেন। মেধা লালন প্রকল্পসহ এই প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য প্রকল্প, ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার পটভূমি এবং এর ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে বক্তব্য দেন প্রতিষ্ঠান প্রধান জনাব তাসনিম হাসান হাই। উনার বক্তব্যের পর প্রথম দিনের কার্যক্রম শেষ হয়।

প্রধান কর্ম-অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ০৮ মার্চ ২০১৯ সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। এ কর্ম-অধিবেশনের প্রথমার্ধে আমন্ত্রিত অতিথি বক্তাগণ ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী সাম্প্রতিক কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন। প্রথমেই 'How to learn better English' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন *ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ* এর ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক রিংকু সাহা। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে, নিয়মিত ও নিবিড় অনুশীলনের মাধ্যমে ইংরেজি ভাষায় পড়া, শোনা, লেখা এবং বলা এই চারটি মৌলিক বিষয়ের উপর কীভাবে পারদর্শী হয়ে ওঠা যায় সে সম্পর্কে বাস্তব উদাহরণ সহকারে দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন তিনি।

পরবর্তী পর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও *সেন্টার ফর ম্যাস এডুকেশন ইন সায়েন্স* (CMES) এর চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম 'Modern Science and Technology: An Overview' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ঘটনা যেমন–মহাবিশ্ব, ডিএনএ, ভূমিকম্প প্রভৃতি বিষয়ক বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ তুলে ধরেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়ে তাদের কৌতুহল নিবৃত করেন। এরপর নবীন ছাত্র এবং ছাত্রীদের জন্য পৃথক পৃথক দুটি আলোচনা পর্বের আয়োজন করা হয়। ছাত্রদের জন্য নির্ধারিত আলোচনা-পর্ব 'Social Environment and Our Daily Life' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট পরিবেশ বিজ্ঞানী জনাব রাগীব উদ্দীন আহমেদ। মূলত যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রয়াসে এই বিষয়টির অবতারণা করা হয়। অপরদিকে মেয়েদের জন্য নির্ধারিত পর্ব 'Personal Hygiene' বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করেন বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেস এর সহযোগী অধ্যাপক ডা. নাতাশা খুরশিদ। মেয়েদেরকে স্বাস্থ্যগত পরিচ্ছন্নতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠার দিক-নির্দেশনা প্রদানই ছিল এই আলোচনার লক্ষ্য। তিনিও ছাত্রীদের অনেক প্রশ্নের জবাব দিয়ে Personal Hygiene বিষয়ে তাদেও জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেন।

দুপুরের বিরতির পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক, বর্তমানে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি (আইইউবিএটি) এর প্রো-ভিসি এবং ফাউন্ডেশনের অনারারী ট্রেজারার এবং TAS Committee-এর চেয়ারম্যান ড. হামিদা আখতার বেগম বক্তব্য রাখেন 'Morality and Education' বিষয়ে। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা, এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিক্ষণ প্রক্রিয়া, সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে ও নৈতিকতার চর্চা সক্রিয় রাখার ক্ষেত্রে পরিবার ও রাষ্ট্রের ভূমিকার বিভিন্ন দিক উদাহরণ সহকারে তিনি তুলে ধরেন। উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীরাও এই আলোচনায় তাদের স্বতঃস্ফূর্ত মতামত ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। বক্তৃতার এক পর্যায়ে 'নৈতিকতা অবক্ষয়ের জন্য সরকারই দায়ী, পরিবার নয়' এ বিষয়ে একটি তাৎক্ষণিক বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়ের পক্ষে ছেলেরা এবং বিপক্ষে মেয়েরা তাদের যুক্তি উপস্থাপন করেন। দুই পক্ষের যুক্তি তর্কে বিতর্ক প্রতিযোগিতাটি খুবই প্রাণবন্ত হয়ে উঠে।

অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্বে ছিলো প্রকল্প'র প্রাক্তণ ও নবীন সদস্যদের সম্মিলনী এবং মুক্ত আলোচনা পর্ব। এ পর্বে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প'র ১৯৮৮ ব্যাচের সদস্য কাজী নজরুল ইসলাম, '৮৮ ব্যাচের ডা. অসিত মজুমদার, '৯৫ ব্যাচের দয়াল কৃষ্ণ দত্ত, ২০০৪ ব্যাচের ডা. এম. আসমাউল আলম আল নূর এবং ২০০৭ ব্যাচের সায়মা সুলতানা জবা। নবীনদের সাথে তাঁরা তাঁদের শিক্ষা এবং কর্মজীবনের দীর্ঘ যাত্রার নানান অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। মেধা ও দক্ষতা অর্জনে ছাত্রজীবনের এই পর্যায়ের প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার জন্য তারা পরামর্শ দেন।

এরপর 'রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি রচনা প্রতিযোগিতা'র পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এ প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকারী আয়েশা সিদ্দিকা (সদস্য নং ৯৩০/২০১১), ২য় স্থান অধিকারী মোছা. মনিরা পারভীন মনি (সদস্য নং ১২৭৯/২০১৭) এবং ৩য় স্থান অধিকারী লিজা আক্তার (সদস্য নং ১০৮৮/২০১৪)-কে পুরস্কার স্বরূপ যথাক্রমে দশ হাজার, আট হাজার এবং পাঁচ হাজার টাকার চেক, সার্টিফিকেট এবং ক্রেস্ট তুলে দেন ফাউন্ডেশনের TAS Committee-এর চেয়ারম্যান ড. হামিদা আখতার বেগম। সর্বশেষে নবনির্বাচিত সদস্য ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ১ম কিস্তির শিক্ষাঋণের চেক বিতরণ করা হয়।

Training Course on Librarianship শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন পরিচালিত বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে 'পল্লী স্কুল পাঠাগার উন্নয়ন প্রকল্প (Rural School Library Enrichment Programme-RUSLEP)' অন্যতম একটি। গত ২১-২৪ই মার্চ ২০১৯ এ প্রকল্প'র আওতায় Training Course on Librarianship শীর্ষক ৪দিন ব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি আদাবর, মোহাম্মদপুরস্থ *পদক্ষেপ ইনিস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট* এর মিলানায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ২৯টি স্কুলের লাইব্রেরিয়ান/লাইব্রেরির দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহ করেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি সমন্বয় করেন ইনস্টিটিউট অব লাইব্রেরি এন্ড ইনফরমেশন সাইন্স, ঢাকা-এর পরিচালক জনাব কাজি আব্দুল মাজেদ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের গভর্নিং বোর্ডের সম্মানিত সদস্য, সরকারের সাবেক সচিব ও এনবিআর-এর সাবেক চেয়ারম্যান জনাব ড. মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ।

প্রশিক্ষণের প্রথমদিন বিকাল ৫টা থেকে ৬টা পর্যন্ত উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের রেজিস্ট্রেশন করা হয়। পরবর্তীতে বিকাল ৬টা থেকে ৭টা পর্যন্ত ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব তাসনিম হাসান হাই সুচনা বক্তব্য দেন। তিনি তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে ফাউন্ডেশনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন। এর পর ২২ থেকে ২৪ তারিখ পর্যন্ত লাইব্রেরি বিজ্ঞানের বিভিন্ন কারিগরি দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এর মধ্যে স্কুল পাঠাগারের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, ছাত্রছাত্রীদের পাঠাভ্যাস গঠন, ক্যাটালগিং, লাইব্রেরি পরিচালনায় আইসিটি'র ব্যবহার, বিবলিওগ্রাফি এবং রেফারেন্স সার্ভিসেস ইত্যাদি আলোচিত হয়। বিষয়গুলোর উপর ক্লাস নেন ড. মো. রুকনুজ্জামান, অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব ইনফরমেশন সাইন্স এন্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. কাজী মোস্তাক গাউসুল হক, অধ্যাপক এবং চেয়ারম্যান, ডিপার্টমেন্ট অব ইনফরমেশন সাইন্স এন্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; জনাব ড. মো. সাইফুল আলম, সহযোগী অধ্যাপক, তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. মো. মিজানুর রহমান, লাইব্রেরীয়ান, ব্যানবেইস, ঢাকা; ড. মো. নাসিরউদ্দিন মুন্সি, অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব ইনফরমেশন সাইন্স এন্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. সাইফুল আলম, অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব ইনফরমেশন সাইন্স এন্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; মো. মাইদুল ইসলাম, সহকারি অধ্যাপক, ডিপার্টমেন্ট অব ইনফরমেশন সাইন্স এন্ড লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; আব্দুল্লাহ আল মোহন, এসিসটেন্ট প্রফেসর, ভাষানটেক সরকারী কলেজ, ঢাকা; মিনহাজউদ্দিন আহমেদ, এডজাঙ্কট ফ্যাকাল্টি, আইএলআইএম এবং আইএলআইএস, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমিরুল আলম খান, সাবেক চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর।

উল্লেখ্য প্রশিক্ষণ শুরুতে প্রশিক্ষণপূর্ব পরীক্ষা বা টেস্ট অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রশিক্ষণ হিসেবে শেষে প্রশিক্ষণ পরবর্তী মূল্যায়ণ পরিক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে সমন্বয়কারী জনাব কাজি আব্দুল মাজেদ প্রশিক্ষণের সমগ্র বিষয়াবলীর উপর একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব ড. মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ শিক্ষার মান বৃদ্ধি ও আলোকিত মানুষ সৃষ্টির জন্য এ প্রকল্পের আওতায় স্কুল লাইব্রেরিগুলো কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

ট্যালেন্ট এসিস্ট্যান্স স্কীম এলামনাই এসোসিয়েটস (TASAA) এর সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৫ জানুয়ারি ২০১৯ শুক্রবার অনুষ্ঠিত মেধা লালন প্রকল্প'র প্রাক্তন সদস্যদের সংগঠন ' ট্যালেন্ট এসিস্ট্যান্স স্কীম এলামনাই এসোসিয়েটস (TASAA)' এর সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে ব্যারিস্টার মো. আবদুল হালিম, সভাপতি; স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস এর সিনিয়র ম্যানেজার নজরুল ইসলাম, সহ-সভাপতি এবং ডায়াবেটিস ফুট কেয়ার বিশেষজ্ঞ ডা. অসিত মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। নয় সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন যথাক্রমে– সহ-সাধারণ সম্পাদক : মোজাম্মেল হক (ব্যাংকার), কোষাধ্যক্ষ : দয়াল দত্ত (ব্যাংকার ও আয়কর উপদেষ্টা), সাংগঠনিক সম্পাদক : মহিউদ্দিন আহমেদ (ম্যানেজার, গ্লোব বায়োটেক), প্রচার সম্পাদক : তরিকুল ইসলাম (সিইও, গুডহোপ বাংলাদেশ)। সদস্য : হেদায়েত উল্লাহ (রিজিওনাল ডাইরেক্টর, এসডিএফ), ইঞ্জিনিয়ার আলী আজম, দেবপ্রসাদ বিশ্বাস (অটিজম স্পেশালিষ্ট) ও মো. আবদুল লতিফ (উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সিভিল অ্যাভিয়েশন)।

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক জনাব তাসনিম হাসান হাই-কে 'প্রধান উপদেষ্টা' করে একটি উপদেষ্টা কমিটিও ঘোষণা করা হয়। উপদেষ্টা কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন : ড. আবদুল খালেক (অধ্যাপক, মলিকিউলার বায়োলজী এন্ড লাইফ সাইন্স, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়), ড. আশীর আহমেদ (অধ্যাপক, কিউসু বিশ্ববিদ্যালয়, জাপান), শাকিল ওয়াহেদ (ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ), ড. জাকির হোসেন রাজু (অধ্যাপক, আইইউবি), ড. সারওয়াত চৌধুরী (আন্তর্জাতিক জলবায়ু বিশেষজ্ঞ), ডা. হাসান মুহাম্মদ আবুল বাশার (ভাস্কুলার সার্জন, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল) এবং ড. মোহাম্মদ শাহ এমরান (অধ্যাপক, ফার্মেসী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।

অভিনন্দন!! আমরা গর্বিত!!

মেধা লালন প্রকল্পের ১৯৮৬ ব্যাচের সদস্য ইমতিয়াজ আহমেদ মজুমদার সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের আইওয়া অঙ্গরাজ্যের St. Ambrose University-র কলেজ অফ বিজনেস এর ফিনান্স বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক থেকে অধ্যাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন। ইমতিয়াজ আহমেদ ১৯৮৬ সালে কুমিল্লা জিলা স্কুল থেকে SSC এবং ১৯৮৮ সালে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে HSC পাশ করেন। উভয় পরীক্ষায় তিনি কুমিল্লা বোর্ডে মানবিক বিভাগের মেধাতালিকায় ১ম স্থান অর্জন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাফল্যের সাথে অর্থনীতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি দুবছর (১৯৯৬-৯৮) সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে শিক্ষকতা করেন। পরবর্তীতে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ নিউঅর্লিন্স থেকে ফিনান্সে পিএইচডি সম্পন্ন করেন। ইমতিয়াজ আহমেদ নিউজিল্যান্ডের Auckland University of Technology এবং যুক্তরাষ্ট্রের The State University of New York-এ অর্ধযুগেরও বেশি শিক্ষকতা করেন। উল্লেখ্য, ২০১৭ সালে তিনি সম্পূর্ন ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাঁর নিজ গ্রাম কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার লালমাই-এর বারপাড়া আমেনা বেগম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করেন। কম্পিউটার ল্যাবটির জন্য তিনি ১৪০০ বর্গফুটের একটি তিনতলা ফাউন্ডেশনের বিল্ডিং, ১৩টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ১টি প্রজেক্টর, ১টি প্রিন্টার, ২টা স্পিকারসহ আরো আনুষঙ্গিক ডিজিটাল সরঞ্জামাদী প্রদান করেছেন। এছাড়াও, তিনি ২০১৭ সাল থেকে উক্ত স্কুলের মেধাবী ১৫ জন ছাত্রীকে বাৎসরিক এককালীন বৃত্তি প্রদান এবং এসএসসিতে জিপিএ ৫ পাওয়া প্রত্যেক ছাত্রীকে এককালীন ১০ হাজার টাকা প্রদান করে আসছেন।

মেধা লালন প্রকল্পের একজন সদস্য হিসেবে ইমতিয়াজ আহমেদ-এর এই অসাধারণ একাডেমিক সাফল্যে আমরা ভীষণভাবে উচ্ছ্বসিত ও গর্বিত। দেশ, মাটি ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ থেকে তিনি যে মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয় এবং প্রকল্পের সকল নবীন সদস্যদের জন্য অনুকরণীয় ও দৃষ্টান্তমূলক। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তাকে জানাচ্ছি প্রাণঢালা আভিনন্দন!! আমরা তাঁর জীবনের উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

বর্তমান মেধালালন প্রকল্পের সদস্যদের মধ্যে যারা ইমতিয়াজ আহমেদ মজুমদার *এর* সাথে যোগাযোগ করতে ইচ্ছুক :
email : mazumderimtiaz@sau.edu; টেলিফোন : +১ (৩১৫) ৯৪১১০৮৮

অভিনন্দন!!

মেধা লালন প্রকল্পের ২০০২ ব্যাচের সদস্য মো. ফারুক হোসেন ৩৫তম বিসিএস (লাইভস্টক) ক্যাডারে উত্তীর্ণ হয়ে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর-এ ভেটেরিনারি সার্জন হিসেবে যোগদান করেছেন। তিনি ইতিপূর্বে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে ডিভিএম সম্পন্ন করেন। মো. ফারুক হোসেন জয়ঝাপ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০০২ সালে এসএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ ৪.৩৮ এবং ২০০৪ সালে সরকারি ইয়াছিন কলেজ, ফরিদপুর থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ ৪.৬০ সহ এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

তাঁর এই সাফল্যে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন!! আমরা তাঁর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

সম্ভাবনার পাশাপাশি বিপদের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে ডিজিটালাইজেশন

জ্যঁ তিরোল

[গত সংখ্যার পর]

অধিগ্রহণের মানসিকতা

নতুন প্রবেশকারীরা বাজারের কর্তৃত্বশীল প্রতিষ্ঠানের হাতে নিজেদের তুলে দেয়ার মাধ্যমে প্রতিযোগিতার দৃশ্যপট আরো বেশি জটিল করে তুলছে। প্রভাবশালী কোম্পানিগুলো এক্ষেত্রে এতটাই বেপরোয়া যে, ভোক্তাদের নতুন কিংবা উন্নত পরিষেবার বিপরীতে নতুন প্রতিষ্ঠানগুলোকে তারা একচেটিয়া দাম ধার্যে উৎসাহিত করছে।

তবে তাদের এ ধরনের আচরণ পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে বলা যতটা সহজ, করা ততটাই কঠিন। অ্যান্টিট্রাস্ট আইন অনুসারে, বিশেষ করে আমেরিকায় এ ধরনের অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া রুখে দিতে কর্তৃপক্ষকে পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণ আনতে হয়। যেমন ওই প্রক্রিয়াটি প্রতিযোগিতা হ্রাসের পাশাপাশি ভোক্তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করবে। বিষয়টি বোধগম্য, তবে আইনের এ ধরনের মানদণ্ড অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া অকার্যকর করার বিষয়টি অসম্ভব করে তোলে। ফেসবুক যেমন ইনস্টাগ্রাম আর হোয়াটসঅ্যাপকে অধিগ্রহণ করেছে। এ-জাতীয় বাস্তব ক্রিয়া সংঘটিত হওয়ার আগে প্রক্রিয়াটির বিপরীতে যাবতীয় তথ্য-প্রমাণ জোগাড় করাটা সম্ভব হয়ে ওঠে না। অ্যান্টিট্রাস্ট আইনের কার্যকারিতা শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগী কর্তৃপক্ষের যোগ্যতা ও নিরপেক্ষতার ওপর নির্ভর করে।

> স্বনির্ভর কর্মীদেরও বিভিন্ন ধরনের নিয়ম-কানুন ও সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। অনেক দেশে স্বাধীন চিকিৎসকদের চাকরিজীবী হিসেবে ধরা হয় না। এমনকি তারা নিজেদের পারিশ্রমিক নিজে নির্ধারণ করতে পারেন না, তাছাড়া তারা নির্দিষ্ট কিছু নিয়মও অনুসরণ করেন, নচেৎ তাদের নিজস্ব স্বীকৃতি হারাতে হয়।

নতুন অ্যান্টিট্রাস্ট আইন

প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের দ্রুত পরিবর্তনের ফলে প্রচলিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ক্রমে অকার্যকর হয়ে পড়ছে এবং প্রতিযোগীর নীতিগুলো সেকেলে হয়ে যাচ্ছে। একচেটিয়া দৌরাত্ম্য পতনে কিংবা পাবলিক ইউটিলিটি নিয়ন্ত্রণে একটি স্থিতিশীল প্রতিযোগিতামূলক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কিংবা বিকল্প সুবিধাগুলো শনাক্তকরণ প্রয়োজন (যেমন রেললাইনের জন্য ট্র্যাক আর স্টেশন কিংবা বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ট্রান্সমিশন গ্রিড)। প্রবিধান বৈশ্বিক কোম্পানিগুলোর কার্যাবলির পুঙ্খানুপুঙ্খ জবাবদিহিতা দাবি করে, সেখানে কোনো আধিজাতিক নিয়ন্ত্রক থাকবে না। প্রতিষ্ঠানগুলোর মুনাফা পরিমাপের জন্য নির্দিষ্ট সংস্থা থাকবে, যা অসম্ভব।

এক্ষেত্রে আমাদের আরো সক্রিয় নীতি নির্ধারণ করতে হবে, যেমন ব্যবসায়িক পর্যালোচনাপত্র (কর্তৃপক্ষ দ্বারা নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে প্রতিষ্ঠানকে তার কাজ চালিয়ে নেয়ার জন্য যে সীমিত বৈধ নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়), নিয়ন্ত্রক বালুঘড়ির অধীনে যেখানে নতুন ব্যবসায়িক মডেলগুলো 'নিরাপদ' পরিবেশে পরীক্ষা করা যেতে পারে। নিয়ন্ত্রক ও অর্থনীতিবিদকেও বিনয়ী হতে হবে; তারা কাজের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন, তাছাড়া তাদের নীতিগুলোও ছুড়ে ফেলা উচিত হবে না।

ভারসাম্য স্থাপন

শ্রম আইন অনুসারে বিষয়টি স্পষ্ট, বর্তমান পদ্ধতিগুলো ডিজিটাল যুগের জন্য উপযুক্ত নয়। উন্নত বিশ্বের বেশির ভাগ শ্রমনীতিগুলো কয়েক দশক আগেও কারখানা শ্রমিকদের কল্পনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন আংশিক হলেও নির্দিষ্ট মেয়াদের শ্রমচুক্তির দিকে মনোযোগ প্রদান করা হয়েছে। তবে এখন তা যথেষ্ট নয়, তাছাড়া টেলিওয়ার্কস, স্বাধীন ঠিকাদার, ফ্রিল্যান্সার, ছাত্র কিংবা অবসরপ্রাপ্তদের অনেকেই এখন উবারের চালক হিসেবে খণ্ডকালীন কাজ করছেন।

কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের উপস্থিতির সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আমাদের বরং কর্মীদের কাজের ফলাফলের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। বৈতনিক অনেক কর্মীর জন্যই বিষয়টি প্রযোজ্য, বিশেষ করে পেশাদারদের ক্ষেত্রে; কর্মক্ষেত্রে যাদের শারীরিক উপস্থিত স্রেফ একটি গৌণ শর্ত বৈ আর কিছু নয়। এছাড়া এমন অনেক পেশাদার কর্মী আছেন, কর্মক্ষেত্রে যাদের অবদান বা প্রচেষ্টাগুলোকে নজরদারি করা কঠিন।

বর্তমান শ্রমবাজারের প্রবণতাগুলোর মুখোমুখি দাঁড়ালে দেখা যায়, আইনপ্রণেতারা প্রায়ই কর্মসংস্থানের নতুন ব্যবস্থাগুলোকে পুরোনো মোড়কেই রাখতে চান। যেমন–একজন উবার চালক কি চাকরিজীবী, নাকি চাকরিজীবী নয়? কিছু লোক হয়তো 'হ্যাঁ' সূচক উত্তর দেবে, কারণ ভাড়া নিয়ে যাত্রীর সঙ্গে দরকষাকষির সুযোগ তাদের নেই। তাছাড়া তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়; যেখানে পরিচ্ছন্ন বাহনের পাশাপাশি সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ও

অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, তুলনামূলক কম রেটিংয়ের কারণে উবার চালকদের বাদ দেয়ার অধিকার রাখে।

অন্যরা হয়তো দ্বিমত পোষণ করে বলবেন, উবারচালকরা চাকরিজীবী নয়। মোটের ওপর তারা সিদ্ধান্ত নিতে স্বাধীন–কখন, কোথায় ও কতটা সময় তারা কাজ করবেন। কিছু চালক আছেন, যাদের উপার্জনের শতভাগই আসে উবার কার্যক্রমের মধ্যমে। অন্যরা হয়তো উবারের পাশাপাশি অন্যান্য রাইড শেয়ারিং প্লাটফর্মে কাজ করেন অথবা কেউ হয়তো আরো বেশি অর্থের আশায় কোনো রেস্তোরাঁয় খণ্ডকালীন চাকরিতে নিয়োজিত। স্বাধীন ঠিকাদারের মতোই তারাও নিজস্ব অর্থনৈতিক ঝুঁকি বহন করেন।

উপরন্তু, স্বনির্ভর কর্মীদেরও বিভিন্ন ধরনের নিয়ম-কানুন ও সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। অনেক দেশে স্বাধীন চিকিৎসকদের চাকরিজীবী হিসেবে ধরা হয় না। এমনকি তারা নিজেদের পারিশ্রমিক নিজে নির্ধারণ করতে পারেন না, তাছাড়া তারা নির্দিষ্ট কিছু নিয়মও অনুসরণ করেন, নচেৎ তাদের নিজস্ব স্বীকৃতি হারাতে হয়।

দুর্ভাগ্যক্রমে উবারচালক ও অন্য প্লাটফর্মের কর্মীদের পদমর্যাদার বিষয়টি খানিকটা তর্কসাপেক্ষ, তবে তা দিয়ে কিছু যায় আসে না। আমরা যেকোনো সিদ্ধান্তেই পৌঁছাই না কেন কিংবা যে শ্রেণীবিন্যাসকে নির্ধারণ করি না কেন, তা ইচ্ছাকৃত আর অযৌক্তিক হবে অথবা ব্যক্তিগত মতামত ও মতাদর্শগত প্রবণতা থেকে কাজের নতুন বিন্যাসগুলোকে ইতিবাচক বা নেতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করা হবে। যেকোনোভাবেই বিতর্কটি খুব একটা অগ্রসর হবে না, কারণ আমরা শ্রমিকদের কল্যাণের চেয়ে কাজকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকি।

এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক নিরপেক্ষতা নিশ্চিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে; বেতনভোগী কর্মী কিংবা স্বনির্ভর ব্যক্তি–কোনো পক্ষকেই অগ্রাধিকার প্রদান করা উচিত নয়। গিগ ওয়ার্কার বা অস্থায়ী শ্রমিকদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক নিরাপত্তার অধিকারসহ রাষ্ট্রের কিছু সুবিধা প্রদান করতে হবে, যেমন উবারচালক। একই সঙ্গে ডিজিটাল প্লাটফর্মকে অযৌক্তিক করে তোলে, এমন অপরিচিত ও বিঘ্ন উৎপাদক নীতিনিয়মকে বাদ দিতে হবে।

গোপনীয়তা পুনরুদ্ধার

ভোক্তাদের ব্যক্তিগত জীবনে অনধিকার ভিত্তিতে প্রবেশকারী প্রতিষ্ঠান আর সরকারকে প্রতিহত করতেও অগ্রগতির প্রয়োজন রয়েছে। বিশ্বব্যাপী আমরা কমবেশি সবাই অবহিত, প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের কাছ থেকে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করে নিয়েছে, যা কোনোভাবেই শুভ নয়। বিষয়টি নিয়ে আমরা সচেতন থাকলেও সার্বিক প্রক্রিয়া ও এর পরিণতির সত্যিকারের মাত্রা উপলব্ধি করতে প্রায়ই ব্যর্থ হই।

একটি বিষয় নিশ্চিত, আমরা যতটা কল্পনা করতে পারি, সরকার আর প্রতিষ্ঠানগুলো আমাদের থেকে তার চেয়েও বেশি তথ্য সংগ্রহ করছে, যার ওপর আমাদের ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণ নেই। উদাহরণস্বরূপ, কোনো একটি কোম্পানি আমাদের কাছ থেকে যেসব তথ্য সংগ্রহ ও জমা করে এবং অন্যদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেয় (ই-মেইল, ছবি কিংবা সোস্যাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে), অথচ ওই প্লাটফর্মগুলো হয়তো আমরা কখনো ব্যবহার করব না কিংবা ব্যবহারে আগ্রহী হব না।

আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে, বিশেষ করে আইনি ব্যবস্থার মৌলিক নীতির বিপরীতে নিজেদের অধিকার নিয়ে অচেতন থাকার আর কোনো সুযোগ নেই। বিভিন্ন প্লাটফর্মে দেয়া নিজেদের সম্ভাব্য সংবেদনশীল তথ্য (যেমন ধর্ম, রাজনীতি, লৈঙ্গিক অবস্থান) নিয়েও আমাদের চিন্তিত হওয়া উচিত। উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত সুদূর প্রসারিত রাষ্ট্রীয় নজরদারির প্রক্রিয়াগুলো নিয়েও।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের জেনারেল ডাটা প্রোটেকশন রেগুলেশন এ ধরনের হুমকি থেকে আমাদের সুরক্ষিত করার পক্ষে ছোট একটি পদক্ষেপ মাত্র। পরবর্তী ধাপে একগুচ্ছ মানসম্পন্ন নীতি তৈরি করা উচিত, যা প্রত্যেকের জন্য বোধগম্য হয় (রাষ্ট্রীয় প্রবিধান উদারপন্থী নিয়ন্ত্রণবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ)।

আশা জাগিয়ে রাখা

পরিশেষে বলব, ইন্টারনেটের কোনো সীমারেখা নেই (যা ইতিবাচক একটি বিষয়), এক্ষেত্রে কর প্রতিযোগিতা রোধে এবং অর্থনীতির বিশাল পরিসর থেকে রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রদানযোগ্য কর দিয়ে রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করতে হবে। অনলাইনে ক্রয়ের ওপর কর প্রতিযোগিতা রোধে ২০১৫ সালের শেষ দিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের চুক্তিটি একটি প্রতিশ্রুতিশীল প্রস্তাবনা। উল্লেখ্য, ইইউ নীতি রাষ্ট্রকে যেকোনো অনলাইন নির্ভর কেনাকাটার ওপর মূল্যসংযোজন কর প্রয়োগের অনুমোদন দেয়, আগের নিয়মে সরবরাহকারীর ওপর কর ধার্য করা হতো।

নতুন ব্যবস্থাটি অ্যামাজনের মতো ব্যবসায়িক মডেলের জন্য সন্তোষজনক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এতে গুগলের মতো প্লাটফর্মগুলোর সমস্যার সমাধান মেলে না। গুগলের মতো প্রতিষ্ঠান মূলত ব্রিটিশ, ডাচ, ফরাসি কিংবা জার্মান ভোক্তাদের কাছে কোনো পণ্য বিক্রি করে না কিন্তু বিজ্ঞাপনদাতাদের ওপর অর্থ ধার্য করে। উন্নত অর্থনীতির নীতিনির্ধারকদের সবাই এ সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করছে, কারণ বই কিংবা মিউজিক বিক্রির মতো বিষয়গুলোয় কর ধার্যের মতোই গুগলের বিষয়টিও সবার কাছে কমবেশি স্পষ্ট।

সবাই বলছে, ডিজিটালাইজেশন সমাজের জন্য দারুণ সব সম্ভাবনা ও সুযোগ নিয়ে এসেছে; তবে একই সঙ্গে এটি কিন্তু অন্যদের বিপন্ন করে তোলার পাশাপাশি নতুন অনেক বিপদের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। এ নতুন বিশ্বে অর্থনৈতিক সুফল অর্জনের জন্য জনসাধারণের আস্থা অর্জন, সামাজিক সংহতি, তথ্য মালিকানা এবং প্রযুক্তিগত প্রসারের প্রভাব সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে। অ্যান্টিট্রাস্ট, শ্রম আইন, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা আর কর আরোপণের মতো বিষয়গুলো ঘিরে আমরা কতটা কার্যকর নতুন পন্থা নিয়ে অগ্রসর হতে পারি, তা ওপর আমাদের সার্বিক সাফল্য নির্ভর করবে।

ভাষান্তর : রুহিনা ফেরদৌস

লেখক: ২০১৪ সালে অর্থনীতিতে নোবেল জয়ী অর্থনীতিবিদ।

bonikbarta.net

স্বাস্থ্য বিষয়ে যত প্রতিকথা

জ্বর, ঠান্ডা ও কাশি নিয়ে আমাদের দেশে প্রচলিত কিছু ধারণা রয়েছে। জ্বর হলে এটা করা যাবে না, ঠান্ডা লাগলে সেটা খাওয়া যাবে না ইত্যাদি। এসব ধারণা বা নিয়মকানুন আদৌ সঠিক কিনা, তা জানি না অনেকেই। অসুস্থতা বা খাবার সম্পর্কিত চিরাচরিত এসব নিয়মকানুন বা ধারণা সবসময় সঠিক নয়। বরং কখনো কখনো দেখা যায় অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার ভয়ে যেটা খাদ্যতালিকা থেকে ছাঁটাই করছেন, হয়তো সেটাই ওই অসুখের আদর্শ কোনো পথ্য। ভুল ধারণা ভাঙতে জেনে নিন নিচের বিষয়গুলো–

ঠান্ডা লাগলে ফল খেতে নেই

এখনো অনেকেই অন্ধভাবে বিশ্বাস করে ঠান্ডা বা কাশিতে কোনো ফলই খাওয়া যাবে না। বর্তমানে ধারণাটি একান্তই ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভিটামিন সি-সমৃদ্ধ ফল ঠান্ডা বা কাশি দূর করতে সহায়ক। পরিমিত পরিমাণ ফল খাওয়া যেতেই পারে। দিনের প্রথম ভাগে ফল খাওয়া উত্তম। কলাকে ঠান্ডা ফল বলে মনে করা হয়। কিন্তু বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে, কলা পেস্ট করে খাওয়ালে তা শিশুদের ঠান্ডা সারায়।

দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার খেতে নেই

ঠান্ডা লাগলে দুধ খাওয়ার ব্যাপারে অনেকের আপত্তি না থাকলেও এখন পর্যন্ত অনেকেই মনে করে, সর্দিতে দই খাওয়া যাবে না। অনেকের বিশ্বাস দই ঠান্ডা খাবার। এটি খেলে কাশি বাড়তে পারে। তবে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ঠান্ডা, কাশি বা জ্বরে দই খাওয়া নিরাপদ। তবে দই ফ্রিজে সংরক্ষণ করা হলে খাওয়ার সময় তা ওভেনে হালকা গরম করে নেয়া ভালো।

জ্বর হলে স্নান বাদ

জ্বর হলে স্নান করা যাবে না, এ ধারণা থেকে অবশ্য আজকাল অনেকেই সরে এসেছে। এখন ডাক্তাররাই বলেন, জ্বর হলে স্নান নিতে। সেক্ষেত্রে ঈষদুষ্ণ পানিতে স্নান নেয়া ভালো। এতে ঘুমটাও ভালো হয়।

ঠান্ডা–কাশিতে শিশুকে ঘি খাওয়ানো বারণ

ভারতীয় উপমহাদেশীয় আনুষঙ্গিক খাবারের মধ্যে অত্যন্ত পুষ্টিকর অনুষঙ্গ এটি। ঘি ফুসফুস ভালো রাখে, ইনফেকশন দূর করে, শুকনা কাশি প্রতিরোধ করে ও মিউকাস দূর করে।

ডিম হৃদস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর

সাধারণের ধারণা ডিম খেলে হৃদরোগ হতে পারে বা বাড়তি কোলেস্টেরলের সমস্যা দেখা দিতে পারে। অনেকেই সপ্তাহে দুটি বা চারটির বেশি ডিম খাওয়া থেকে বিরত থাকতে বলে। বিশেষত যাদের টাইপ টু ডায়াবেটিস ও হৃদরোগ রয়েছে, তাদের এ নিয়ম মেনে চলার কথা বলা হয়। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, ডিম খাওয়ার সঙ্গে হৃদরোগ বা ডায়াবেটিস বেড়ে যাওয়ার কোনো যোগসূত্র নেই।

বণিকবার্তা ৯ মার্চ ২০১৯

হারিয়ে যাচ্ছে শিষ্টাচার

আমি অন্যজনের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলে তার বিনিময়ে আমিও ভালো ব্যবহার পাব। তাই আগে নিজেকে সচেতন হতে হবে, তারপর অন্যজনকে সচেতন করার কথা ভাবতে হবে। আমি অন্যায় কাজ করি, আর মানুষকে বড় বড় লেকচার দেই- অন্যায় কাজ করো না, সেটা তো হতে পারে না। আমি কেমন সেটা কাজে প্রমাণ করাটাই আসল বিষয়।

একদিকে সমাজ যখন আধুনিকতার ছোঁয়ায় ভাসছে, অন্যদিকে তখন হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের শিষ্টাচার আর সৌজন্যবোধ। হারিয়ে যাচ্ছে নৈতিকতা, মানবতা আর মনুষ্যত্ব। সমাজে কমে যাচ্ছে ছোট-বড় পার্থক্য। কমছে সম্মান আর স্নেহ। কমছে গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি। বলা যায়, শিষ্টাচারের স্থানটি লোপ পেয়ে যাচ্ছে সমাজ থেকে। আর এর জন্য অনেকটাই দায়ী বড়রা। একটা শিশু বেড়ে ওঠার সময় সে সমাজ ও পরিবারে যা দেখবে তা-ই গ্রহণ করবে। আমার সন্তান খারাপ হতে থাকলে ভাবতে হবে আমারও কিছু সমস্যা রয়েছে। আমি গালি দিলে আমার সন্তান সেটা কেন শিখবে না? তাই বড়রা ঠিক হলে ছোটরাও ঠিক থাকবে।

স্কুল-কলেজে শিক্ষকরা ক্লাসে প্রবেশ করলে দাঁড়িয়ে যাওয়াটা নিয়ম মনে করেই ছাত্ররা দাঁড়ায়। বাস্তবে সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে দাঁড়ানোর মানসিকতা ছাত্রদের ভেতর এখন আর জাগ্রত নেই। কারণ এ ধরনের শিক্ষা তারা পায় না। আর শিক্ষাটা যে পরিবার থেকে আসবে তা নয়। সেটা আসতে পারে সমাজ থেকে, স্কুল থেকে, বড় ভাই থেকে, বন্ধু থেকে, কর্মস্থল থেকে, কিংবা কোনো সংগঠন থেকে। কিন্তু বাস্তবে সমাজ, পরিবার, স্কুল-কলেজ, বন্ধু-বান্ধব, বড়ভাই কিংবা সংগঠন কোথাও এই শিক্ষা নেই।

এখন ছোটদেরও বড়দের ওপর আঘাত করতে দেখা যায়। যার ভেতর শিষ্টাচার, সৌজন্যবোধের অভাব থাকবে সে তো বড়দের আঘাত করবেই। আর এর দায় বড়দেরকেই নিতে হবে। আজকাল বড়রাই ছোটদের এই শিষ্টাচার, নৈতিকতা ও ভদ্রতা থেকে দূরে রাখছে। তারাই ছোটদের নিয়ে কুকর্ম আর অন্যায় পথে হাঁটছে। এ থেকে ছোটরা কী শিখবে! আপনি যদি আপনার বড়কে সম্মান না দেন, তাহলে আপনাকে আপনার ছোটজন কীভাবে সম্মান দেবে? আর আপনিই বা সেই সম্মান কীভাবে আশা করবেন? তাই সচেতন হতে হবে আপনাকে-আমাকে এখন থেকেই। যার যার অবস্থান থেকে মানবিকতা, নৈতিকতা, নম্রতা, ভদ্রতা, শিষ্টাচার ও সৌজন্য প্রদর্শন এবং ভালো ব্যবহার করতে হবে। তবেই অন্যজন শিখবে। আমি অন্যজনের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলে তার বিনিময়ে আমিও ভালো ব্যবহার পাব। তাই আগে নিজেকে সচেতন হতে হবে, তারপর অন্যজনকে সচেতন করার কথা ভাবতে হবে। আমি অন্যায় কাজ করি, আর মানুষকে বড় বড় লেকচার দেই- অন্যায় কাজ করো না, সেটা তো হতে পারে না। আমি কেমন সেটা কাজে প্রমাণ করাটাই আসল বিষয়।

তাই আসুন আমরা প্রত্যেকে যার যার স্থান থেকে সচেতন হই। এর ফলে একদিন দেশ হয়ে উঠবে ভালোবাসায় ভরপুর। সবার ভেতর থাকবে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা। তাই এখন থেকে নিজেদের ভেতর সেই মানসিকতা তৈরি করতে হবে। ছোটদের স্নেহ আর বড়দের সম্মান দিয়ে আগে নিজেরা নিজেদের ঠিক করি। তখন আমার কাছ থেকে বড় বা ছোট সবাই শিক্ষা পাবে। পরিশেষে বলতে চাই, মুখে নয়, কাজে শিষ্টাচারের প্রমাণ দিতে হবে।

আজহার মাহমুদ
শিক্ষার্থী, ওমরগনী এমইএস কলেজ, চট্টগ্রাম
যুগান্তর ২৪ মার্চ ২০১৯

মেনা ট্রটঃ ব্লগকে আমজনতার কাতারে নামিয়ে আনার পিছনের কারিগর

আজকালকার খুব পরিচিত কিছু মাধ্যমের মাঝে তরুণ প্রজন্মের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি মাধ্যম ব্লগ। ব্যক্তিগত মতামত থেকে শুরু করে সংবাদ প্রকাশ পর্যন্ত সবকিছুতেই সমানভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ব্লগের। শুরুতে এতোটা জনপ্রিয় না হলেও আস্তে আস্তে ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা এবং সহজে ব্লগ ব্যবহার করা যায় বলে বর্তমানে মাধ্যম হিসেবে খুবই জনপ্রিয়। কিন্তু শুরুতে ব্লগ এমন ছিল না, বরঞ্চ তা ছিল জনসাধারণের আয়ত্ত্বের বাইরে।

এখন প্রায় অনেক মানুষই ব্লগ লিখেন এবং পড়েন। এছাড়া আয় রোজগারও সম্ভব হচ্ছে ব্লগের মাধ্যমে। যে কয়েকজন মানুষ ব্লগের এই পরিবর্তনটুকুর মাধ্যমে আমাদের সামনে সহজবোধ্য এক রূপে হাজির করেছেন, তার মাঝে মেনা ট্রট অন্যতম। পুরো নাম মেনা গ্রবোস্কি ট্রট।

প্রথম জীবনে ডিজাইনার হিসেবে কাজ শুরু করলেও এটা নিয়ে কোনভাবেই সুখী ছিলেন না মেনা ট্রট। ১৯৭৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর ট্রটের জন্ম। তার মা ছিলেন কিউবান বংশোদ্ভূত। ইংলিশের ছাত্রী ট্রটের লেখালেখির প্রতি ছিল দুর্নিবার আকর্ষণ। তাই ডিজাইনার হবার পরেও লেখালেখির জগতটা তাকে প্রচন্ড হাতছানি দিতে থাকে।

একসময় সেই হাতছানিই তাকে ব্লগের দিকে ঠেলে দেয়। তাছাড়া মাথায় ছিল 'আমি কিছু করে সেরা হতে চাই' এই ভাবনা। তিনি সবসময় ভাবতেন অনেক কিছু করার চেয়ে কিছু একটা করে সেরা হওয়াটা ভালো। সেজন্য মানুষ যেটা বেশি ভালো পারে সেটা নিয়েই সামনে যাওয়া উচিত। ট্রটের শক্তিশালী দিক ছিল তার লেখার জগত। লেখাকে সামনে তুলতে পারলে আমি হয়তো সেরা হতে পারব– এই চিন্তাধারা থেকেই মেনা'র ব্লগ লেখা শুরু।

ব্লগ সম্পর্কে আমাদের বিভিন্নজনের বিভিন্নরকম ধারণা রয়েছে। একসময় শুধু খবর প্রকাশ করাকেই ব্লগ বলে অভিহিত করা হত। সেখানে নিয়ত ভয়ংকর সংবাদের প্রাধান্য বেশি ছিল। সুতরাং ব্লগের মানেই তখন ছিল ভীতিকর কিছু। কিন্তু ক্রমান্বয়ে এই ধারণার পরিধি পরিবর্তন হয়েছে। জরুরি অবস্থায় খবরাখবর পৌঁছানোর দ্রুততম মাধ্যম হিসেবেও হয়েছে জনপ্রিয়। এছাড়াও মানুষকে জানানোর জন্য বিভিন্ন কাজে ব্লগ হয়েছে প্রধান হাতিয়ার। খবর ছাড়াও আমাদের চারপাশের জগতকেও ব্লগের মাধ্যমে তুলে ধরা যাচ্ছে। তরুণ প্রজন্মের কাছেও হয়েছে সমান জনপ্রিয়। খবরাখবর ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনও ঠাঁই পেয়েছে এখানে। এবং সেটাও সম্ভব হয়েছে ট্রটের হাত ধরে। মূলত এখন আমরা ব্লগকে যে রূপে দেখি তার পেছনে ট্রটের অবদান অনেকখানি। বলা যায়, ব্লগ বিপ্লব শুরুই হয়েছে ট্রটের হাত ধরে।

২০০১ সালে ২৩ বছর বয়সে মেনা ট্রটের ব্লগিং এর ক্যারিয়ার শুরু হয়। যেহেতু তিনি লেখালেখির জগত বেশি ভালোবাসতেন তাই ছোট ছোট গল্পকেই ব্লগে স্থান দিলেন। একসময় এই ছোট গল্পগুলোই মানুষকে উৎসাহ দিল। এগার বছর বয়সের একটি ক্রিশ্চিয়ান ক্যাম্প অভিজ্ঞতার ইলাস্ট্রেশন দিয়ে তার প্রথম ব্লগ। এরপরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে তার ব্যক্তি জীবনের কথা উঠে এসেছে তার ব্লগে। সংবাদের উপস্থাপনের বাইরেও যে ব্লগকে ব্যবহার করা যায় সেটা ট্রটের কাছ থেকেই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। ব্যক্তিগত জীবনধারাও যে উপস্থাপনের বিষয় হতে পারে মেনা সেটিকেই বিভিন্ন আঙ্গিকে দেখিয়েছেন। আমি সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে জনপ্রিয় না হতে পারলেও ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের মাঝে জনপ্রিয় হতে পারি, এই ধারণাকে কেন্দ্র করে তার ব্লগিং এর জীবন শুরু হয়। যেহেতু ইন্টারনেট আমাদের জীবনকে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছে এবং আমরা সহজেই একে অপরের সাথে কানেক্টেড থাকতে পারি সেখানে অতি দ্রুতই মেনার ধারণা জনপ্রিয়তা পায়। এবং দেখা যায় ব্যক্তি জীবনের গল্প শেয়ার করার পরে কিছু মানুষও পাওয়া যায় যারা পরিবারেরও অংশ হয়ে দেখা দেয়।

শুরু থেকেই মেনা ট্রট একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন দ্য সাউথ অ্যাওয়ার্ড এর, যেটা সাউথ ইস্ট উইব্লগ থেকে দেয়া হয়। ব্লগিং এর নতুন জীবন শুরু করার আগে পর্যন্ত তার তেমন কোন অ্যাওয়ার্ড ছিল না। এবং যেহেতু তিনি তার লেখালেখির মাধ্যমে পরিচিত হতে চেয়েছিলেন ব্লগিং তাকে সেই সাহায্যই করেছিল। তার জনপ্রিয়তা অবশেষে তাকে অ্যাওয়ার্ডটি এনে দিয়েছিল। এছাড়া ২০০৪ সালে পিসি ম্যাগাজিনেও এসেছিলেন ট্রট এবং ৩৫ বছরের নিচে সেরা শত আবিষ্কারকের তালিকায় তার নাম ছিল একই বছর।

মেনা ট্রট The Sew Weekly পরিচালনা করতেন। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল 'প্রতি সপ্তাহে অন্তত একটি কাপড় সেলাই করুন' এই ধারণাকে ছড়িয়ে দেয়া। এই ধারণার মাঝে তার মায়ের জন্য কাপড় (সেলিব্রেটিং মাদার'স) এবং গোলাপি ফেব্রিকের কাপড়ও সমান জনপ্রিয়। এভাবে প্রতি সপ্তাহে মেনা চেষ্টা করতেন নতুন ধারণাকে তুলে ধরার। যদিও এই ব্লগ প্রজেক্টটি ২০১২ সালে শেষ হয়।

প্রতিদিন প্রায় দশ হাজারের মত মানুষ মেনা ট্রটের ব্লগ পড়ে থাকেন। সর্বদা হাসিখুশি ট্রট সাধারনত ব্যক্তিগত জীবন কিংবা তার সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে ব্লগ লিখতে তিনি বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। এই তালিকায় তার পরিবার পরিজন, আত্মীয়স্বজন, ছোটবেলার বন্ধু এমনকি পোষা পাখিও ছিল। মূলত এসব বিষয়ের জন্যই ট্রট ব্যক্তিগত ভাবেও সমান জনপ্রিয়।

ব্যক্তিগত জীবনে মেনা ট্রট বিবাহিতা, স্বামী বেনজামিন ট্রট। দুইজন মিলে পরে সিং এ্যাপার্ট নামক একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন। সিং অ্যাপার্ট নামের কারন তারা ছয়দিন আগে পরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ট্রট ছিলেন এই কোম্পানির প্রেসিডেন্ট। অবশ্য তারা মুভেবল টাইপ এবং টাইপ্যাড নামক সফটওয়্যারেরও প্রতিষ্ঠাতা। এর মাঝে মুভেবল টাইপ ২০০১ সালে তৈরি হয় এবং পরে একে সিং অ্যাপার্টের কাজে লাগানো হয়। এছড়াও এসেনশিয়াল ব্লগিং নামে মেনা ট্রটের একটি বইও রয়েছে।

নাফিস নাদভী
neonaloy.com May ৭, ২০১৮

প্রশিক্ষণ পাবে এক লাখ বেকার

বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রামের (সেইপ) আওতায় বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিংয়ের (বিপিও) পাঁচ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কল সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (বাক্য)। এতে মোট এক লাখ বেকার প্রশিক্ষণ পাবে। এরই মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত পাঁচ হাজার ৭৮৪ জন প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ১১ হাজার জন প্রশিক্ষণ পাবেন। এ প্রকল্প চলমান থাকবে ২০৩০ পর্যন্ত। ঢাকার ১৭টি, চট্টগ্রাম ও যশোরের একটি করে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

কেন এই প্রশিক্ষণ

সেইপ প্রকল্পের বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কল সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিংয়ের (বাক্য) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়কারী মো. মাহতাবুল হক বলেন, 'বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং খাতে দেশে দক্ষ জনবল তৈরিই মূল লক্ষ্য। আউটসোর্সিং খাতের বড় একটা বাজার রয়েছে। মূলত সেটিকে লক্ষ্য রেখে দক্ষ কর্মী গড়ে তুলতে এ উদ্যোগ। এ খাতের একজন দক্ষ কর্মী শুধু দেশে নয়, দেশের বাইরেও কাজের সুযোগ পাবে।'

বিষয়, মেয়াদ ও যোগ্যতা

দ্বিতীয় পর্যায়ে আড়াই মাস মেয়াদি প্রফেশনাল কাস্টমার সার্ভিস কোর্সটিতে প্রশিক্ষণ পাবে ৮ হাজার ২০০ জন। প্রফেশনাল ব্যাক অফিস সার্ভিস কোর্সের মেয়াদও আড়াই মাস। এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাবে ১ হাজার ৭০০ জন। দুই মাস মেয়াদি প্রফেশনাল ডিজিটাল কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাবে ৪০০ জন। তিন মাস মেয়াদি ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং আউটসোর্সিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাবে ৩০০ জন। আড়াই মাস মেয়াদি মেডিক্যাল স্কাবিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ পাবে ৪০০ জন। সব বিষয়ে প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে ন্যূনতম স্নাতক বা চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা। বয়সসীমা ১৮ থেকে ৪৫ বছর।

আবেদন যেভাবে

আবেদন ফরম পাওয়া যাবে বাক্যর ওয়েবসাইটে (www.bacco.org.bd)। বাক্য মনোনীত ১৯টি প্রতিষ্ঠান থেকে আবেদন ফরম সংগ্রহ ও জমা দেওয়া যাবে। কোন প্রতিষ্ঠান থেকে কী কী বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে তা জানা যাবে ওয়েবসাইটে। সরাসরি অফিসে গিয়েও জানা যাবে দরকারি তথ্য। মনোনীত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা বাক্যর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। আবেদন ফরম পূরণ করে পাসপোর্ট আকারের দুই কপি ছবি, চারিত্রিক সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি ও শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের সত্যায়িত কপিসহ জমা দিতে হবে।

প্রার্থী নির্বাচন যেভাবে

তিন মাস পর পর ভর্তি নেওয়া হয়। অফিস চলাকালে নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে হাতে হাতে, ডাকযোগে বা ই-মেইল করে আবেদনপত্র পাঠানো যাবে। খামের ওপর বিষয়ের নাম উল্লেখ করতে হবে। আবেদন যাচাই-বাছাই করে ডাকা হবে মৌখিক পরীক্ষার জন্য। মো. মাহতাবুল হক জানান, সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে বাছাই করা হবে। তবে প্রতিষ্ঠানভেদে নেওয়া হতে পারে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা।

সাক্ষাৎকারে শিক্ষাগত যোগ্যতা, কম্পিউটার জ্ঞান, উপস্থিত বুদ্ধিমত্তা, আচার-ব্যবহার, কেন প্রশিক্ষণ নিতে চায় জানতে চাওয়া হতে পারে। দেখা হতে পারে আউটসোর্সিং কাজের প্রতি আগ্রহ। অগ্রাধিকার পাবে বেকার, আদিবাসী, নারী, প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী। প্রার্থীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। সেপ প্রজেক্টের অন্য কোনো প্রশিক্ষণে ভর্তি হলে বা আগে প্রশিক্ষণ নিলে আবেদন করা যাবে না।

সরকারের সেইপ প্রকল্পের আওতায় এক লাখ বেকারকে বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (বিপিও) বিষয়ে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেবে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কল সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (বাক্য)। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলবে ২০৩০ সাল পর্যন্ত।

প্রশিক্ষণের ধরন

বিপিও খাতের দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকরা প্রশিক্ষণ দেবেন। থিউরিক্যাল এবং প্রাকটিক্যাল এই দুই পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সপ্তাহে পাঁচ দিন ক্লাস হবে। সকাল, দুপুর ও বিকেল-তিন শিফটে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রতি ব্যাচে ভর্তির সুযোগ পাবে ২৫ জন।

মিলবে ভাতা ও চাকরি

কোর্স শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মূল্যায়নের জন্য নেওয়া হবে পরীক্ষা। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে মিলবে সনদ। ৮০ শতাংশ উপস্থিতি থাকলে দৈনিক ১০০ টাকা হারে যাতায়াত ভাতা দেওয়া হবে। প্রশিক্ষণ নেওয়া ৬০ শতাংশ প্রশিক্ষণার্থীর চাকরির ব্যবস্থা করবে আয়োজকরা। তবে সবার চাকরি পাওয়ার বিষয়ে সহায়তা করে কর্তৃপক্ষ।

খোঁজ জানবেন যেভাবে

বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। বাক্যর ওয়েবসাইটে এবং মনোনীত প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে ভর্তি তথ্য পাওয়া যাবে। বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে বাক্যর ওয়েবসাইটে (www.bacco.org.bd)। বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব কল সেন্টার অ্যান্ড আউটসোর্সিং (বাক্য), অ্যাপার্টমেন্ট বি-২, বাড়ি ৫৯, রোড-২৮, গুলশান-১, ঢাকা ঠিকানায় সরাসরি ও ০৯৬১৪৩৩৪৪৫৫ নম্বরে ফোন করেও জানা যাবে দরকারি তথ্য।

ফরহাদ হোসেন
কালের কণ্ঠ, ১৪ নভেম্বর ২০১৮

দেশের সেরা ১০ পর্যটন স্পট

বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের রয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যত। কেননা এখানে রয়েছে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে ভরপুর সব স্থান। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া এই ৫৬ হাজার বর্গমাইলের দেশ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। এখানে আমরা বাংলাদেশের সেরা ১০টি পর্যটন কেন্দ্র সম্পর্কে জানবো।

কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত

বঙ্গোপসাগেরর কুল ঘেঁষে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের অবস্থান। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম সমুদ্র সৈকত। বাংলাদেশের পর্যটন অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু কক্সবাজার এবং কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত। সমুদ্র, সামুদ্রিক মাছ আর সমুদ্রের অজস্র রত্নভাণ্ডরের সম্ভার নিয়ে কক্সবাজার আপনার মনকে জয় করবে।

সেন্ট মার্টিনস

বঙ্গোপসাগরেদক্ষিণ-পূর্ব অংশে সেন্ট মার্টিনস দ্বীপ। এটি কক্সবাজার সমুদ্র উপকূল থেকে ৯ কিলোমিটার দক্ষিণে এবং মায়ানমার উপকূল থেকে ৮ কিলোমিটার পূর্বে নাফ নদীর মোহনায় অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের একমাত্র কোরাল দ্বীপ। সেন্টমার্টিনকে নারিকেল জিঞ্জিরা বলা হয়।

নীলগিরি পর্যটনকেন্দ্র

বাংলাদেশের বান্দরবান জেলায় অবস্থিত পাহাড়ের কোলে নীলগিরি পর্যটনকেন্দ্র। এখান থেকে খুব সহজেই মেঘ ছুঁতে পারবেন। নীলগিরি পর্যটনকেন্দ্র সুমদ্র পৃষ্ঠ থেকে ২২০০ মিটার উঁচুতে অবস্থিত।

সুন্দরবন

বাংলাদেশের একেবারে দক্ষিণে অবস্থিত ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন। জোয়ার ভাটার মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য গাছগুলো এক বিশেষ শ্বাসমূল তৈরি করে। বিশ্বের সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন। ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত এ বনেই একমাত্র রয়েল বেঙ্গল টাইগারের দেখা পাওয়া যায়। এছাড়াও এখানকার হরিণ, লবণাক্ত পানির কুমির বিখ্যাত।

ষাট গম্বুজ মসজিদ

বাংলাদেশের দক্ষিণ পশ্চিমের জেলা শহর বাগেরহাট শহরের অন্যতম আকর্ষণীয় স্থাপত্যের নিদর্শন ষাট গম্বুজ মসজিদ। মসজিদটি নির্মাণ করেন খান জাহান আলী। ধারণা করা হয় এ মসজিদটি ১৮শ শতকের দিকে তৈরি করা হয়। ষাট গম্বুজ নাম হলেও এটাতে ৭৭টি গম্বুজ আছে। ১৯৮৩ সালে ইউনেস্কো ষাট গম্বুজ মসজিদকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের সম্মানে ভূষিত করে।

কুয়াকাটা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত সমুদ্র সৈকত কুয়াকাটা। কুয়াকাটা সাগরকন্যা নামে পরিচিত। ১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত বাংলাদেশের পর্যটনের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু। কুয়াকাটার বিশেষত্ব হচ্ছে এখান থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দুইটাই দেখা যায়। এখানে রয়েছে মিশ্রীপাড়া বৌদ্ধ মন্দির। যেখানে রয়েছে উপমহাদেশের সবচেয়ে উঁচু বৌদ্ধ মূর্তি।

দক্ষিণের ভাসমান বাজার

শতবর্ষের পুরোনো ঐতিহ্যবাহী ভাসমান বাজার বাংলাদেশের দক্ষিণের জেলা শহর ঝালকাঠি থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে ভিমরুলি গ্রামের কৃত্তিপাশা খালের উপর অবস্থিত। এখানকার হাট স্থানীয় গ্রামের মানুষের জীবিকার উৎস। পেয়ারা ও আমড়ার মৌসুমে প্রায় তিন মাস এ হাট জমজমাট থাকে।

সাজেক ভ্যালি

বাংলাদেশের রাঙ্গামাটি জেলার সাজেক ইউনিয়নের আকর্ষণীয় পর্যটনকেন্দ্র সাজেক ভ্যালি। রাঙ্গামাটি জেলার ছাদ নামে পরিচিত সাজেক ভ্যালি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৮০০ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। আশে পাশের গ্রামগুলোতে বসবাস করা লুসাই, ত্রিপুরা এবং পাংখুয়া উপজাতিদের বসবাস সাজেক ভ্যালিকে আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে।

টাঙ্গুয়ার হাওর

টাঙ্গুয়ার হাওর বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেটের সুনামগঞ্জ জেলায় অবস্থিত একটি হাওর। প্রায় ১০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এ হাওর বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম মিঠা পানির জলাভূমি। স্থানীয় লোকজনের কাছে হাওরটি নয়কুড়ি কান্দার ছয়কুড়ি বিল নামেও পরিচিত। এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় রামসার স্থান, প্রথমটি সুন্দরবন।

সোনারগাঁও

১৬১০ সাল পর্যন্ত সোনারগাঁও ছিল বঙ্গ অঞ্চলের শাসন কাজ চালানোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সোনারগাঁও-এর প্রাচীন নাম ছিল সুবর্ণগ্রাম। শাসন কাজ পরিচালনার জন্য মুসলমান শাসকরা এখানে অনেক স্থাপনা নির্মাণ করেন। এগুলোর মধ্যে খাসনগর দিঘি, দুলালপুরের নীলকুঠি, গোয়ালদি শাহী মসজিদ, আমিনপুর মঠ, দামোদরদি মঠ, পানাম নগরের আবাসিক ভবন, বড় সরদার বাড়ি প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ওদের স্বাধীনতা

রমেশ রায়
সদস্য ৪৭৬/২০০২

ওরা ছিল বাংলা মায়ের কোল জুড়ে
ওরা পরশ পেয়েছিল মায়ের আঁচলের
অমৃত সুধা পান করে হয়েছিল হৃষ্টপুষ্ট,
আপন গৌরব মহিমায় ছিল তুষ্ট ।
কিন্তু কালের অনাহুত অমানিশা,
মুছে দেয় সুখ, মুছে দেয় আশা ।
শত অপমান, লাঞ্ছনা একে একে
হয়ে হল শংকিত, পুঞ্জিত বুকে এ
শংকিত ক্রোধের দাবানল জ্বলে উঠল
একযোগে, অপশক্তির বিরুদ্ধে
আক্রোশে ফেটে পড়ল রাজপথে
শতাধিক নয়, লক্ষ লক্ষ
সাথে ঢেলে দিয়েছিল তাজা রক্ত
বলেছিল যদি লাগে আরো দেব ।
তবু পশ্চাৎপদতা,
মানি নাকো শত্রুর বর্বরতা ।
আনতে চাই সহস্র বাধা
অতিক্রম করে স্বপ্নের স্বাধীনতা ।

নবীন জুলাই-ডিসেম্বর ২০০৪ সংখ্যা থেকে নেওয়া ।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর

মোছা. খাদিজা খাতুন
সদস্য ১২২৫/২০১৬

দিনের আলো নিভে এল সূর্যি ডোবে ডোবে ।
আকাশ ঘিরে মেঘ জমেছে চাঁদের লোভে লোভে ।
মেঘের উপর মেঘ করেছে, রঙের উপর রং ।
মন্দিরেতে কাঁসর ঘন্টা বাজল ঠং ঠং ।।
ও পাড়েতে বৃষ্টি এল, ঝাপসা গাছপালা,
এ পাড়েতে মেঘের মাথায় একশো মানিক জ্বালা ।
বাদলা হাওয়ায় মনে পড়ে ছেলেবেলার গান–
বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদে এল বান ।

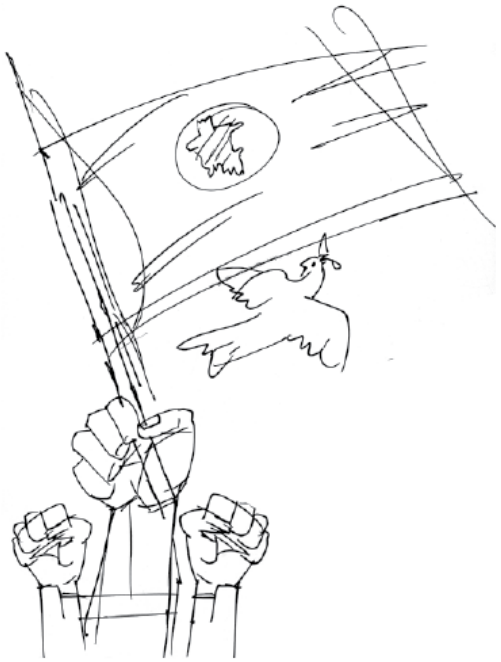

Let Us Try

Sarwat Chowdhury
Member No. A 0015/85

When roses bloom in plesant rightness,
Butterflies fly from flower to flower,
How I enjoy them, the grace, the sweetness,
The music, the colour-all nature's dower.

But when I see a spider in its web
I become afraid, because I know

An insect it is going to entrap
And kill with its poison slow.

When I see in countries near and far-
War, terror, death and pools of blood shed,
I am panniced, my feelings get a jar,
It may be our lot if madness and hatted are bred.

Let us try and let us take the oath,
We will never to us let it happen,
We will make our land a peaceful abode,
Where happiness will never be broken.

(প্রতিভা - সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ সংখ্যা থেকে নেওয়া)

বিসিএস প্রস্তুতি

অগ্নিপরীক্ষার জন্য তৈরি তো?

কাজে দেবে প্রশ্ন সমাধান

একাধিক জব সলিউশন সংগ্রহ করে নিন। সর্বশেষ বিসিএস পর্যন্ত সব প্রশ্ন সলভ করে ফেলুন। পিএসসির নন-ক্যাডার পরীক্ষার প্রশ্নগুলোও বুঝেশুনে সলভ করুন। নিয়ম করে পড়তে হবে দৈনিক পত্রিকা। ইন্টারনেটে চোখ রাখতে হবে, জানতে হবে আপডেট তথ্য। হাতে সময় কম। টপিক নির্বাচনে সতর্ক হোন। প্রশ্ন ঘাঁটাঘাঁটি করলে নিজেই বুঝতে পারবেন অপ্রয়োজনীয় টপিক কোনগুলো। বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) সাবেক সদস্য ড. আশরাফুল ইসলাম চৌধুরীর পরামর্শ–অনেকে রেফারেন্স বইয়ে অনেক সময় ব্যয় করে, এতে সময় নষ্ট হয় এবং বিসিএস নিয়ে অহেতুক ভীতি তৈরি হয়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

ব্যাকরণ অংশের সিলেবাস ও বিগত বছরের প্রশ্ন দেখে বইয়ের অধ্যায়গুলো দাগিয়ে বারবার পড়ুন। সাহিত্য অংশে বিগত বছরের প্রিলিমিনারি আর লিখিত পরীক্ষার সিলেবাস স্টাডি করে কোন ধরনের প্রশ্ন আসে, কোন ধরনের প্রশ্ন আসে না, সে সম্পর্কে ভালো ধারণা নিন।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও বিবর্তন এবং এর যুগ বিভাগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমার্থক শব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ, বাগধারা, এককথায় প্রকাশ ও পরিভাষা-এ রকম কিছু টপিক থেকে প্রতিবছরই প্রশ্ন আসে।

ইংরেজি

৩৬তম বিসিএসে প্রশাসন ক্যাডারে প্রথম ইসমাইল হোসেন জানান, ভালো মানের Grammar বই থেকে প্রস্তুতি নিতে হবে। বেশিরভাগ পরীক্ষার্থীর ভীতির জায়গা vocabulary বারবার চর্চা করলে এ অংশে ভালো করা সম্ভব। প্রতিদিন ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতা বুঝে বুঝে পড়তে হবে। নতুন শেখা শব্দগুলো দিয়ে ছোট ছোট বাক্য লেখার চর্চা করলে কাজে দেবে। Literature অংশে ইংরেজি সাহিত্যের খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের Prominent Work-গুলো পড়তে হবে।

গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা

ভালো করার মূলমন্ত্র অনুশীলন। গণিতে সাধারণত প্রশ্ন কমন পড়ে না। খুব বেশি পটু না হলে নির্দিষ্ট সময়ে অন্য বিষয়গুলো কাভার করে গণিতের সব প্রশ্নের উত্তর করা কঠিন। তাই আয়ত্ত করতে হবে কম সময়ে গণিতের সমাধান করার কৌশল। এ ক্ষেত্রে নিয়মিত অনুশীলনের অভ্যাস কাজে দেবে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় সাধারণত এমন সব অঙ্কই থাকে, যা শর্টকাটে সমাধান করা যায়।

মানসিক দক্ষতায় বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশ্ন করা হয়। কমনসেন্স, বিচারবুদ্ধি কাজে লাগালেই এ অংশে ভালো করা যাবে। আইকিউ টেস্টের বই প্রস্তুতিতে কাজে আসবে। অনেক ওয়েবসাইট আছে, যাতে আইকিউ টেস্ট থাকে।

দৈনন্দিন বিজ্ঞান

৩৩তম বিসিএস পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধাতালিকায় প্রথম রিদওয়ান ইসলাম জানান, বিজ্ঞানের প্রশ্ন এমনভাবে সেট করা হয়, যাতে যেকোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের প্রার্থীরই সমান সুযোগ থাকে। এ বিষয়ে ভালো করার জন্য কী পরিবর্তন হচ্ছে, নতুন কী আবিষ্কার হচ্ছে, কী ঘটছে–এসব ঘটনা জানতে হবে। পদার্থ, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার ও আবিষ্কারকের নাম জানতে হবে। নবম-দশম শ্রেণির সাধারণ বিজ্ঞান বোর্ড বই ভালোভাবে পড়তে হবে।

কম্পিউটার ও তথ্য–প্রযুক্তি

প্রাথমিক ধারণাভিত্তিক প্রশ্ন আসে। সাধারণত এর ব্যতিক্রম হয় না। তাই চিন্তার কিছু নেই। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের কম্পিউটার শিক্ষা বইগুলো ভালোমতো পড়লে প্রিলিমিনারির জন্য বাড়তি তেমন কিছু না পড়লেও চলে। বাজারে কম্পিউটার ও তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ে অনেক বই পাওয়া যায়। বাড়তি প্রস্তুতির জন্য এসব বই দেখতে পারেন।

সাধারণ জ্ঞান

নিয়মিত চোখ রাখুন খবরের কাগজ ও ইন্টারনেটে। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স, কারেন্ট ওয়ার্ল্ড প্রভৃতি সাধারণ জ্ঞানবিষয়ক সাময়িকী প্রস্তুতিতে সহায়ক হতে পারে। বিসিএসের আগে এসব মাসিক পত্রিকা বিশেষ সংখ্যাও বের করে। প্রস্তুতিতে ইন্টারনেট হতে পারে সহায়ক। গুগলে ইংরেজিতে কিংবা ইউনিকোড বা অভ্রতে বাংলায় টাইপ করে গুগলে সার্চ করে পড়তে পারেন।

নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

নেতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন বিষয়টি মজার। এখানে জানা বিষয়গুলো থেকেই প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা বেশি। উত্তর করার জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার হবে কমনসেন্স। একটুখানি মাথা খাটালেই উত্তর বের করা সম্ভব। সিলেবাসের টপিকসংশ্লিষ্ট অনেক লেখা ইন্টারনেটে পেয়ে যাবেন। বিগত পরীক্ষার প্রশ্ন থেকে কমন পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ভূগোল, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

মাধ্যমিক ভূগোল পড়লে কাজে দেবে। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ের সংশ্লিষ্ট অধ্যায় থেকেও প্রস্তুতি নিতে পারেন। নবম-দশম শ্রেণির বইয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাবিষয়ক অধ্যায়টি ভালো করে পড়তে হবে। পড়তে পারেন অনার্স পর্যায়ের বইও।

লক্ষ্য থাকুক অটুট

ড. আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী জানান, বিসিএসের প্রস্তুতির জন্য মাইন্ডসেট অনেক গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্যটা স্থির করতে হবে, সে অনুযায়ী চেষ্টা করে যেতে হবে। প্রস্তুতি যত ভালো হবে, পরীক্ষায় টেকার সম্ভাবনাও ততটাই বাড়বে। একটা কাগজে লিখে ফেলুন, আপনি কোন কোন টপিকে দক্ষ। লিখে ফেলুন দুর্বলতার জায়গাগুলোও। এবার পরিকল্পনা করুন, কীভাবে দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে উঠতে পারেন। বিসিএস পরীক্ষায় ভালো করতে মেধা ও বুদ্ধিমত্তার চেয়ে পরিশ্রমের মূল্য বেশি। সব বিষয়েরই বেসিক ভালোভাবে জানতে হবে। এ ক্ষেত্রে যে যত বেশি জেনে নিতে পারবে, প্রতিযোগিতায় সে তত বেশি এগিয়ে থাকবে।

রায়হান রহমান

কালের কণ্ঠ ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদনের নিয়ম ও প্রস্তুতি

দীপন মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় গ্র্যাজুয়েশনের শেষ ধাপ সম্পন্ন করছে। আর শেষ সেমিস্টারেই ইন্টার্নশিপের জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছে সে। একটি ডিজিটাল এজেন্সি ও একটি বেসরকারি ব্যাংকে ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদনও করেছে। কিন্তু তার সহপাঠীদের অনেকেই দ্বিধায় ভুগছে কোথায় ইন্টার্নি করবে ও কীভাবে আবেদন করবে, সে বিষয়ে।

প্রথমে বলে রাখা ভালো, ইন্টার্নশিপ কোনো পেশা নয়, তবে তা কর্মজীবনের সঙ্গে যোগসূত্র তৈরি করে। এর মাধ্যমে মেজর কোর্সের সঙ্গে মিল রেখে নানা কাঙ্ক্ষিত পেশা বিষয়ে অভিজ্ঞতা তৈরি হয়। ফলে পরবর্তীতে সে পেশা বা সেক্টরে নিজেকে অধিষ্ঠিত করতে পারলে অভিজ্ঞতাসাপেক্ষে মানিয়ে নিতে সুবিধা হয়। পাশাপাশি এ সময়টা পরবর্তীতে ক্যারিয়ার গঠনে দিকনির্দেশনা দেয় এবং এ পেশা ব্যক্তির জন্য কতটা উপযোগী তার ধারণা পাওয়া যায়। তাই ইন্টার্নশিপের রেজিস্ট্রেশন করার পর থেকেই খোঁজখবর নেয়া শুরু করতে হবে। কথা বলতে হবে ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকদের সঙ্গে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একটু সিনিয়র শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেও ধারণা নেয়া যেতে পারে। ইন্টার্নশিপের জন্য আবেদন করারও বিশেষ কিছু নিয়ম রয়েছে। বলা হলো এখানে–

মার্জিত সিভি তৈরি করুন

নিজের প্রাতিষ্ঠানিক ফল, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা তুলে একটি মার্জিত সিভি তৈরি করুন। কারণ একটি ভালো মানের সিভি প্রতিষ্ঠানের নজর কাড়ে বরাবরই।

আবেদনের শেষ তারিখ সম্পর্কে ধারণা রাখুন

আবেদনের শেষ তারিখ কবে তা আগেই জেনে নিন। এর মধ্যেই আবেদন করুন। কারণ আবেদন করতে দেরি হলে আপনার ইন্টার্নশিপের সময়সীমাও ওদিকে পিছিয়ে যাবে।

একসঙ্গে কয়েকটি স্থানে আবেদন

ইন্টার্নশিপের জন্য কখনই একটি প্রতিষ্ঠানে আবেদন করা ঠিক না। এতে ঝুঁকি থাকতে পারে। অন্তত তিনটি স্থলে আবেদনপত্র পাঠান। খুব ভালো হয় পরিচিত, এমন প্রতিষ্ঠানে আবেদন করতে পারলে।

ইন্টারভিউর জন্য প্রস্তুতি

ইন্টারভিউর আগে একটু ধারণা নিয়ে নিন কী কী ধরনের প্রশ্ন করা হতে পারে। নিজেও অনুশীলন করুন স্পষ্টভাবে গুছিয়ে উত্তর দেয়ার। আর অবশ্যই প্রতিষ্ঠানের রীতি অনুযায়ী পোশাক পরিধান করতে হবে।

ইন্টার্নশিপ শুরু করার পর

বলে রাখা ভালো, ইন্টার্নি করার সময় অনেকেই অমনোযোগিতার সঙ্গে তিন মাস সময় কাটান। কিন্তু এটি মোটেও ভালো দিক নয়। হয়তো একটি ভালো রিপোর্ট তৈরি করে আপনি কাঙ্ক্ষিত ফল অর্জন করতেই পারেন, কিন্তু ইন্টার্নশিপে ভালো কর্মদক্ষতা দেখাতে পারলে অত্র ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে কাজ করার সুযোগও তৈরি হতে পারে। তাই পেশা হিসেবে গ্রহণ করার আগে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করার বেশকিছু সুবিধা এখানে পাবেন।

সুযোগের সদ্ব্যবহার

অফিসে আপনি যে ধরনের কাজ করতে আগ্রহী, তা শুরু থেকে মনোযোগসহকারে বোঝার ও জানার চেষ্টা করুন। ক্যারিয়ার নিয়ে যে স্বপ্ন, সেটি আরো বিশ্লেষণ করুন। দলবদ্ধভাবে কাজ করার বিষয়ে যদি অস্বস্তি থেকে থাকে, তবে আপনার সঙ্গে মিল রয়েছে, এমন দু-একজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করুন। ধীরে ধীরে তাদের কাছ থেকে বুঝে জেনে নিন এক্ষেত্র সম্পর্কে। মোটকথা নিজের আগ্রহকে অর্জনে রূপান্তর করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুন।

নিজের দক্ষতা প্রমাণ

শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করার পুরো সময়টাই শেখা ও নিজের দক্ষতা প্রমাণের। অফিসে কাজ শুরু করার কিছুদিনের মধ্যে বুঝে যাবেন, কর্মক্ষেত্র আপনার কাছে কী আশা করে এবং এদের লক্ষ্য কী। সেভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে মনোযোগ দিন। আপনার আগ্রহ ও উদ্যম চোখে পড়লে হয়তো ভবিষ্যতে ফুলটাইম কর্মী হিসেবে এখানেই সুযোগ তৈরি হবে।

যোগাযোগ তৈরি

প্রতিটি কর্মস্থলেই নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-কানুন রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সময়ানুবর্তিতা। পাশাপাশি সহকর্মীদের সঙ্গেও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখুন। সহকর্মীকে এমন কোনো নেতিবাচক কথা বলবেন না, যাতে আপনাকে ও আপনার সহকর্মীকে বিব্রতকর পরিস্থিতির স্বীকার হতে হয়। অন্যদিকে আপনার সুপারভাইজার সন্তুষ্ট হন, এমন আচার-আচরণ করতে হবে।

সক্রিয়তা

যেখানে ইন্টার্নি করছেন, সেখানে নিজের কাজের পরিধি জেনে নিজ থেকেই দায়িত্ব পালন করুন। না বুঝলে সিনিয়রের সাহায্য নিন, বুঝে নিন পরবর্তী সময়ে এমন সমস্যা হলে কী করতে হবে। সময়ের কাজ সময়ে করুন। অহেতুক কাজ জমিয়ে রাখবেন না। তাহলে আপনার সুনাম হবে ও কাজের ওপর নির্ভরযোগ্যতা তৈরি হবে।

সূত্র: ওয়ে আপ ও দ্য ব্যালান্স ক্যারিয়ার
bonikbarta.net ১ এপ্রিল ২০১৯

মেধা লালন প্রকল্প'র ছাত্র-ছাত্রীরা বর্তমানে কে কোথায় পড়ছে

ব্যাচ ২০১৫ (ছাত্রী)

ক্রমিক	ছাত্র-ছাত্রীর নাম, সদস্য নং ও ঠিকানা	বর্তমানে কোথায় পড়ছে
১.	নাজনীন লিজা ১১৪৬/২০১৫ চালনা বাজার, দাকোপ, খুলনা।	ইংরেজি, ১ম বর্ষ শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।
২.	মোছা. আলহামরা খাতুন ১১৪৭/২০১৫ চৌবিলা বাজার, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।	উদ্ভিদ বিজ্ঞান, ১ম বর্ষ সরকারি আকবর আলী কলেজ, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।
৩.	মোছা. আঁখি খাতুন ১১৪৮/২০১৫ বাগদুয়ার, পীরগঞ্জ, রংপুর।	কম্পিউটার টেকনোলজী, লেভেল-৩ কুড়িগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কুড়িগ্রাম।
৪.	মোছা. তানিয়া তাহিদ তানি ১১৪৯/২০১৫ সিন্দুর্ণা, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	উইমেন এন্ড জেন্ডার স্টাডিস, ১ম বর্ষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৫.	উম্মে হাবিবা পিয়া ১১৫১/২০১৫ খেদাপাড়া, মনিরামপুর, যশোর।	জেনিটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড বায়ো টেকনোলজি, ১ম বর্ষ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।
৬.	মোছা. ফারজানা আক্তার ১১৫৪/২০১৫ বেলকা, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।	ইংরেজি, ১ম বর্ষ সরকারি মুজিবুর রহমান মহিলা কলেজ, বগুড়া।
৭.	সীমা বেগম ১১৫৫/২০১৫ কলাদিয়া, পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ।	কম্পিউটার টেকনোলজি, ১ম বর্ষ কিশোরগঞ্জ পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, কিশোরগঞ্জ।
৮.	ফাতেমা খাতুন ১১৫৭/২০১৫ কালিগঞ্জ হাট, তানোর, রাজশাহী।	ইতিহাস, ১ম বর্ষ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৯.	ফাতেমা আক্তার ১১৫৮/২০১৫ দক্ষিণ মরুয়াদহ, শোভাগঞ্জ, সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা।	ইতিহাস ও প্রত্নতত্ব, ১ম বর্ষ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।
১০.	মোছা. সিনথিয়া নাজনীন ১১৫৯/২০১৫ পশ্চিম বেজগ্রাম, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	ইংরেজি, ১ম বর্ষ হাতীবান্ধা আলিমুদ্দিন কলেজ, লালমনিরহাট।
১১.	মোছা. তাসলিমা সুলতানা ১১৬০/২০১৫ ধনতোলা, গংগাচড়া, রংপুর।	রসায়ন, ১ম বর্ষ সরকারি কুড়িগ্রাম মহিলা কলেজ, কুড়িগ্রাম।
১২.	মোছা. জান্নাতুল ফেরদৌস ১১৬১/২০১৫ রুহিয়া, ঠাকুরগাঁও।	পদার্থবিজ্ঞান, ১ম বর্ষ ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ, ঠাকুরগাঁও।
১৩.	সুজাতা রায় ১১৬৩/২০১৫ নওদাবাস হাট, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	ডিপ্লোমা ইন নার্সিং, ১ম বর্ষ নার্সিং ইনস্টিটিউট কুষ্টিয়া।
১৪.	মোছা. নাজমা খাতুন ১১৬৪/২০১৫ বগদইড় হাট, বিরল, দিনাজপুর।	রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ১ম বর্ষ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
১৫.	মিতালী বিশ্বাস ১১৬৫/২০১৫ চুনকুড়ি, দাকোপ, খুলনা।	পদার্থবিজ্ঞান, ১ম বর্ষ খুলনা সরকারি মহিলা কলেজ, খুলনা।
১৬.	শারমিন আক্তার ১১৬৮/২০১৫ পশ্চিম বেজগ্রাম, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	সমাজ বিজ্ঞান, ১ম বর্ষ কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।
১৭.	মোছা. আইরিন খাতুন ১১৬৯/২০১৫ লালপুকুর, মিঠাপুকুর, রংপুর।	গণিত, ১ম বর্ষ সরকারি মহিলা কলেজ, পঞ্চগড়।
১৮.	সুমি রানী দাস ১১৭০/২০১৫ সিন্দুর্ণা, হাতীবান্ধা, লালমনিরহাট।	রাষ্ট্রবজ্ঞান, ১ম বর্ষ কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ, কুড়িগ্রাম।

মাথায় কত প্রশ্ন আসে

মুখ ও মুখোশ কী?

মুখ ও মুখোশ বাংলাদেশের (তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের) প্রথম স্থানীয়ভাবে নির্মিত পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক চলচ্চিত্র। ১৯৫৬ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এই ছবিটি পরিচালনা করেন আবদুল জব্বার খান। ইকবাল ফিল্মস্ এই ছবিটি অর্থায়ন ও চিত্রায়নে সহায়তা করে। চলচ্চিত্রটি ১৯৫৬ সালের ৩ আগস্ট মুক্তি পায়। ছবিটির প্রথম প্রদর্শনী হয় মুকুল প্রেক্ষাগৃহে (বর্তমান আজাদ প্রেক্ষাগৃহ)। এটি ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ এবং খুলনায় একযোগে মুক্তি পায়। এই অঞ্চলের প্রথম চলচ্চিত্র হিসাবে দর্শকমহলে এটি নিয়ে আগ্রহের সৃষ্টি হয়। প্রথম দফায় মুক্তির পর চলচ্চিত্রটি ৪৮,০০০ রুপি আয় করে।

আবদুল জব্বার খানের ডাকাত নাটক হতে চলচ্চিত্রটির কাহিনি নেয়া হয়। ১৯৫৩ সালে তিনি চলচ্চিত্রটির কাজ শুরু করেন। সে সময় দৃশ্যত পূর্ব পাকিস্তানে নিজস্ব কোন চলচ্চিত্র শিল্প গড়ে উঠেনি। স্থানীয় সিনেমা হলগুলোতে কলকাতা অথবা লাহোরের চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হতো। পশ্চিম পাকিস্তানের চলচ্চিত্র প্রযোজক এফ. দোসানির পূর্ব পাকিস্তানে চলচ্চিত্র প্রযোজনার ব্যাপারে নেতিবাচক মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়ে জব্বার খান চলচ্চিত্রটি নির্মাণে উদ্যোগী হন। জব্বার খান দুই বছর ধরে ছবিটির কাজ করেন। ১৯৫৪ সালের ৬ই আগস্ট আবদুল জব্বার খান তার পরিচালনায় প্রথম সবাক চলচ্চিত্র 'মুখ ও মুখোশ'-এর মহরত করেন হোটেল শাহবাগে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ইস্কান্দার মির্জা ছবির মহরতের উদ্বোধন করেন। স্থানীয় অভিনেতারা, চলচ্চিত্রে অভিনয়ের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই বিনা পারিশ্রমিকে এই ছবিতে অভিনয় করেন। স্থানীয়ভাবে কোন ফিল্ম প্রোডাকশন স্টুডিও না থাকায়, ছবির নেগেটিভ ডেভেলপের জন্য লাহোরে পাঠানো হয়। লাহোরের শাহনূর স্টুডিওতে 'মুখ ও মুখোশ'-এর পরিস্ফুটন কাজ সম্পন্ন হয়। ১৯৫৬ সালে ছবির কাজ শেষ হয় কিন্তু তিনি ছবিটি নিয়ে প্রথমে ঢাকায় ফেরার অনুমতি পাননি। 'মুখ ও মুখোশ'র প্রথম প্রদর্শনী হয় লাহোরে। ঢাকায় ফিরে আসার পর ছবিটি প্রদর্শনীর বিষয়ে কোন প্রেক্ষাগৃহের মালিকের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়াও পাননি। তবে এ অবস্থা কাটাতে বেশি সময় লাগেনি। অল্পদিন পরেই 'মুখ ও মুখোশ' ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম এবং খুলনায় একযোগে প্রদর্শিত হয়। ছবিটির প্রিমিয়ার শো অনুষ্ঠিত হয় রূপমহল প্রেক্ষাগৃহে।

রেনেসাঁস কী?

রেনেসাঁস বা পুনর্জাগরণ (ফরাসিঃ Renaissance রেনেসঁস্, ইতালীয়ঃ Rinascimento) মধ্যযুগের পরে ও রিফর্মেশনের আগে বিশেষ করে ইতালিতে ও সাধারণভাবে গোটা ইউরোপের এক ঐতিহাসিক যুগকে বোঝায়। এই যুগের ব্যাপ্তিকাল ছিল আনুমানিক চর্তুদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত। এ যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাচীন পুস্তক অধ্যয়নের অনুশীলন বৃদ্ধি, রাজকীয় ও ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতার উত্থান, চিত্রকলায় দৃষ্টিভঙ্গির ব্যবহার, এবং বিজ্ঞানের সামগ্রিক উন্নতি। বর্তমানে রেনেসাঁস বলতে অন্যান্য ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পর্যায়কেও বোঝানো হয়ে থাকে। রেনেসাঁস কনস্টান্টিনোপলের পতন এবং প্রিন্টিং বিপ্লব দ্বারা প্রসারিত হয়েছিল।

মেধাস্বত্ব কী?

মেধাস্বত্ব বা কপিরাইট (ইংরেজিঃ Copyright) বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিদ্যমান একটি আইনি অধিকার, যাতে কোনও মৌলিক সৃষ্টিকর্মের মূল সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত অন্য কোনও পক্ষ সেই সৃষ্টিকর্ম ব্যবহার করতে পারবে কি না কিংবা কোন্‌শর্তে ব্যবহার করতে পারবে, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেওয়ার ব্যাপারে ঐ মূল সৃষ্টিকর্তাকে একক ও অনন্য অধিকার প্রদান করা হয়। মেধাস্বত্ব সাধারণত একটি সীমিত মেয়াদের জন্য কার্যকর হয়। ঐ মেয়াদের পর কাজটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ক্ষেত্রের বা জনক্ষেত্রের (পাবলিক ডোমেইনের) অন্তর্গত হয়ে যায়। মেধাস্বত্ব ছাড়াও আরেক ধরনের মেধা সম্পদ অধিকার বা স্বত্ব আছে, সেটি হল শিল্প সম্পত্তি স্বত্ব। এই অনন্য অধিকারগুলি পরম অধিকার নয়, বরং এগুলির সীমাবদ্ধতা ও ব্যতিক্রম আছে (যেমন নায্য ব্যবহার বা ফেয়ার ইউজ)।

বৌদ্ধিক বা মেধাভিত্তিক সৃষ্টিকর্মটি যদি কোনও গ্রন্থ হয়, তাহলে বাংলাতে তার মেধাস্বত্বকে বিশেষ একটি পরিভাষা 'গ্রন্থস্বত্ব' দ্বারা নির্দেশ করা হয়। এছাড়া গ্রন্থ ব্যতীত অন্যান্য রচনার জন্য সাধারণভাবে 'লেখস্বত্ব', 'রচনাস্বত্ব', ইত্যাদি পরিভাষাও প্রচলিত।

মেধাস্বত্বের ইংরেজি পরিভাষা 'কপিরাইট' বলতে আক্ষরিক অর্থে কোন মৌলিক সৃষ্টির 'অনুলিপি তৈরির অধিকার' বোঝায়।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই অধিকারগুলো সীমিত সময়ের জন্য সংরক্ষিত থাকে। মেধাস্বত্ব বা কপিরাইটের আন্তর্জাতিক চিহ্ন হল (এতে ইংরেজি Copyright শব্দের আদ্যক্ষর ঈ-কে একটি বৃত্তের ভেতরে স্থাপন করা হয়েছে), এবং কিছু কিছু স্থানে বা আইনের এখতিয়ারে এটার বিকল্প হিসেবে (c) বা (C) লেখা হয়।

সৃষ্টিশীল, বুদ্ধিবৃত্তিক কিংবা শিল্পের বিভিন্ন প্রকার কাজের একটা বিরাট পরিব্যাপ্তিতে মেধাস্বত্ব থাকতে পারে বা হওয়া সম্ভব। কবিতা, অভিসন্দর্ভ, নাটক এবং অন্যান্য সাহিত্যকর্ম, চলচ্চিত্র, নৃত্যবিন্যাস (নাচ, ব্যালে ইত্যাদি), সঙ্গীত রচনা, ধারণকৃত শব্দ, চিত্রকর্ম, অংকন, মূর্তি বা প্রতিকৃতি, আলোকচিত্র, সফটওয়্যার, বেতার ও টেলিভিশনের সরাসরি ও অন্যান্য সম্প্রচার, এবং কিছু কিছু এখতিয়ারে শিল্প-নকশা (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন) এর অন্তর্গত।

নকশা বা শিল্প-নকশাগুলোর (ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিজাইন) জন্য কোন কোন এখতিয়ারে আলাদা বা যুগপৎ/অধিক্রমণকারী (ওভারল্যাপিং) আইন থাকতে পারে। মেধাস্বত্ব আইন, বুদ্ধিবৃত্তিক বা মেধা সম্পদ (ইন্টেলেকচুয়্যাল প্রোপার্টি) সংক্রান্ত একটি ব্যাপ্ত বিষয়ের অধীনে অনেকগুলি আইনের একটি।

মেধাস্বত্ব আইন শুধুমাত্র ঠিক কী উপায়ে বা কী রূপে ধারণাসমূহ (আইডিয়া) অথবা তথ্য পরিবেশিত হবে সেটা বিবেচনা করে। এটা মেধাস্বত্ব সংরক্ষিত কাজের মূল ধারণা, মূলনীতি (কনসেপ্ট), সত্য (ফ্যাক্ট), ধরন (স্টাইল) অথবা পদ্ধতিটিকে আওতাভুক্ত করে না বা করার চেষ্টা করে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মিকিমাউস কার্টুন বিষয়ে যে মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ করা আছে, এটা অননুমোদিত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই কার্টুন বিতরনের অধিকার রহিত করে এবং অননুমোদিত কেহ ডিজনীর সৃষ্ট মানুষসদৃশ মিকিমাউসের মত একই রকম কোন ছবির অনুলিপি বা নকল করতে পারবে না; কিন্তু এই আইন সাধারণভাবে মানুষের মত দেখতে অন্য কোন ইঁদুর আঁকতে বা সৃষ্টি করতে বাধা দেয় না– যতক্ষণ সেগুলো ডিজনীর মূল নকশা থেকে যথেষ্ট অন্যরকম থাকে এবং ওটার (মিকিমাউসের) নকল বা অনুলিপির মত না হয়। কিছু কিছু এখতিয়ারে, মেধাস্বত্ব সংরক্ষিত কাজের বিদ্রুপাত্মক বা ব্যাখ্যামূলক কাজ প্রকাশেরও উপায় থাকে। ট্রেডমার্ক এবং প্যাটেন্ট-এর মত অন্যান্য আইনের ধারা পুনঃপ্রকাশ বা পুনঃউৎপাদন কিংবা ব্যবহারের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে, যেটা মেধাস্বত্ব আইন করে না ।

মেধাস্বত্ব আইনগুলোকে কোন কোন দেশে বার্ন আন্তর্জাতিক সমঝোতার মত আন্তর্জাতিক সমঝোতার মাধ্যমে স্বীকৃত ও প্রমিতকরণ করা হয়েছে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মত আন্তর্জাতিক সংস্থা বা বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য দেশগুলিতে এটা প্রয়োজন হয়।

ভার্চুয়াল রিয়েলিটি কী?

প্রকৃত অর্থে বাস্তব নয় কিন্তু বাস্তবের চেতনার উদ্যোগকারী বিজ্ঞাননির্ভর কল্পনাকে ভার্চুয়াল রিয়েলিটি বা অনুভবের বাস্তবতা কিংবা কল্পবাস্তবতা বলে। ভার্চুয়াল রিয়েলিটি হচ্ছে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত সিস্টেম, যাতে মডেলিং ও অনুকরণবিদ্যা প্রয়োগের মাধ্যমে মানুষ কৃত্রিম ত্রিমাত্রিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিবেশের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন বা উপলব্ধি করতে পারে। ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে অনুকরণকৃত পরিবেশ হুবহু বাস্তব পৃথিবীর মতো হতে পারে। এ ক্ষেত্রে অনেক সময় ভার্চুয়াল রিয়েলিটি থেকে বাস্তব অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়। আবার অনেক সময় অনুকরণকৃত বা সিম্যুলেটেড পরিবেশ বাস্তব থেকে আলাদা হতে পারে। যেমন: ভার্চুয়াল রিয়েলিটি গেমস। এতে ত্রিমাত্রিক ইমেজ তৈরির মাধ্যমে অতি অসম্ভব কাজও করা সম্ভব হয়।

ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে ব্যবহারকারী সম্পূর্ণরূপে একটি কম্পিউটারনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে নিমজ্জিত হয়ে যায়। তথ্য আদান-প্রদানকারী বিভিন্ন ধরনের ডিভাইসসংবলিত হেড মাউন্টেড ডিসপ্লে, ডেটা গ্লোভ, পূর্ণাঙ্গ বডি স্যুইট ইত্যাদি পরিধান করার মাধ্যমে ভার্চুয়াল রিয়েলিটিতে বাস্তবকে উপলব্ধি করা হয়। এ খাতে বর্তমানে উন্নত বিশ্বে প্রচুর অর্থ ব্যয় করছে। সম্প্রতি গুগলও লাইভলি নামে ভার্চুয়াল চ্যাটিং সার্ভিস চালু করেছে। যেখানে ভার্চুয়াল কক্ষে বা পরিবেশে যে কেউ তার বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের নিয়ে প্রবেশ করতে পারে। সেখানে ইচ্ছেমতো বস্তু দিয়ে সাজানো, বন্ধুদের সঙ্গে মারামারি, নাচানাচি আবেগের গ্রাফিক্যাল প্রকাশ ইত্যাদি সম্ভব।

ছবি : পেইন্টিং ইন ব্রাউন | মাধ্যম : তৈলচিত্র | শিল্পী : মোহাম্মদ কিবরিয়া

ছবি : নৌকা সারাই | মাধ্যম : জলরং | শিল্পী : কামরুন নাহার

নবীন

সপ্তদশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯

সম্পাদক তাসনিম হাসান হাই কর্তৃক হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, ৯-সি, রূপায়ন শেলফোর্ড
প্লট নং-২৩/৬, ব্লক-বি, বীর উত্তম এ এন এম নুরুজ্জামান সড়ক, শ্যামলী, ঢাকা ১২০৭ এর পক্ষে প্রকাশিত।
প্রচ্ছদ : যাযাবর মিন্টু। মুদ্রণ : পালক ০১৭১১৮৩৪০১৭। গ্রাফিক ডিজাইন : মমিন হোসেন